শিক্ষা ও সমাজ

অনুবাদ : রাহাত খান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ :

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

জুন, ১৯৬৫

প্রকাশক :

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রচ্ছদ : মাহবুবুর রশীদ

মুদ্রাকর :

আবদুল কুদ্দুস সাদী

টাইম প্রেস

১৫/১, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩

ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আলোচ্য গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়নি। বিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এতে কেবল সেগুলি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত বিষয়ে মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে অথবা যে সব বিষয়ে ১৯৬০-এর দশকে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে সে সব বিষয়ে এতে কোনো আলোচনা করা হয়নি, ঘটনাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

এই প্রবন্ধটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উঠতি সমস্যাগুলির উপর আলোচনা করা হয়েছে। আর্থিক সমৃদ্ধি এবং কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে এই গ্রন্থে সেই সমস্যাগুলির উপরই মোটামুটিভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব-সমাজ ও বিশ্ব-নিয়মের উপর তার যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তার ফলে সমস্ত সমাজের শ্রেণী-কাঠামোতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কেও এতে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মৌলিক পার্থক্যসমূহ

এই প্রবন্ধে শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে পার্থক্য করে দেখান হয়েছে। মানুষকে বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য সুচিন্তিত ও সংঘবদ্ধভাবে সাহায্য করার প্রচেষ্টাকে 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমি এই ব্যবহার বিধিটিকেই বেছে নিয়েছি তার কারণ আমি বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ দায়-দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধা,

পরিবর্তন এবং অসুবিধাসমূহ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। মানুষ যা তার তা হয়ে ওঠার পিছনে পরিবার, প্রতিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, যোগাযোগের মাধ্যম ও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটি ভূমিকা থাকে। এই প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি। আমি জানি কোনো ব্যক্তির বাস্তব জীবনে এই ধরনের বিমূর্ত ভাবধারা প্রশ্রয় পায় না; শুধু বিষয়টিকে সুগম করে তোলার জন্যই এটাকে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে শিক্ষা সমঝোতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয় বলা যায়। এ ছাড়া শিক্ষার আর কোনো "বাস্তবানুগ" লক্ষ্য নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য খ্রীস্টান, গণতন্ত্রী কম্যুনিস্ট, শ্রমিক, নাগরিক, ফরাসী অথবা ব্যবসায়ী "উৎপাদন" করা নয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে মানুষের উন্নতিসাধনই এর লক্ষ্য। মনুষ্যশক্তির বৃদ্ধি সাধন নয়, মনুষ্যত্ব অর্জনই এর লক্ষ্য।

কমিনউয়াস (Comenius)-এর উক্তিগুলিকে এই প্রবন্ধের মূল সূত্র হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'দি গ্রেট ডিডাক্টিচ' গ্রন্থে বলেছেন:

মানুষকে যিনি 'শিক্ষণীয় জীব' বলে অভিহিত করেছেন তিনি খুব একটা খারাপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা বলা যায় না। আর এ কথাও অত্যন্ত স্বীকার্য যে শুধু যথাযথভাবে শিক্ষা পেলেই মানুষ মানুষ হয়ে উঠতে পারে... ...শিক্ষা বলতে আমি মানুষের জন্য যা কিছু সঠিক এবং শুভ তাকেই বোঝাতে চাইছি। এই শিক্ষায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের অধিকার থাকতে হবে.....

প্রত্যেক মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হোক এটাই আমরা একান্তভাবে কামনা করি। এ ব্যাপারে উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-যুবা ইত্যাকার কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি করা চলবে না। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই এ ব্যাপারে প্রধান শর্ত হিসাবে বিবেচিত হতে হবে। সর্ব জাতির সর্ব অবস্থার সর্ব বয়সের সর্ব ধরনের মানুষ যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে সে ব্যবস্থাই করা উচিত।

আমাদের দ্বিতীয় ইচ্ছাটি হলো, সব মানুষ যেন পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা-লাভ করতে পারে। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে অথবা বিশেষ কতকগুলি বিষয়ে কিংবা অসংখ্য বিষয়ে এই শিক্ষা প্রদান করলে চলবে না। মানুষের প্রকৃতিকে যে সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণতা দান করে সে সমস্ত শিক্ষাই তাকে দিতে হবে.....

এই সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে অতীত এবং বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই কিছু না কিছু পরিমাণে অমানবিক মনুষ্যত্ব খর্বকারী এবং মনুষ্যত্ব বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়।

শিক্ষা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষার সাক্ষাৎ প্রকাশ ঘটে শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলি হয় রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত অথবা রাষ্ট্রের অনুমোদিত হয়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাজনৈতিক সম্প্রদায় যা চায় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তার প্রতি-ফলন ঘটবেই। শিক্ষা-ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে। তবে এর পূর্বশর্ত হিসাবে এতে ওই সম্প্রদায়ের সম্মতি থাকতে হবে। সম্প্রদায়টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের অবকাশ থাকতে হবে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রতিটি শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই কিছু না কিছু সত্যিকার শিক্ষার রেশ থাকে। এই দিকটি শিক্ষা-ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের কাছে অসহনীয় এবং অবাঞ্ছিত বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। ধরা যাক, কোনো একটি দেশ তার সব নাগরিককে বিজ্ঞানী অথবা কারিগর করে গড়ে তুলতে চায়— এটাই জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধির পথ— এবং বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান করতে চায় না। আরও ধরা যাক যে, এই দেশটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সরকারী আদেশ নির্দেশ এবং ভাবাদর্শের বাইরে আর কিছু শেখাতে চায় না। এই ধরনের একটি রাষ্ট্র হয়ত শেষাবধি

সংশ্লিষ্ট ছাত্রবর্গকে শুধু এই বিধিনিষেধের গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখতে সফল হবে না। এই ধরনের বাধানিষেধ ছাত্রসমূহকে সরকারী পাঠ্য-সূচী ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আরও কিছুর সন্ধানে ব্যাহত হতে উৎসাহিত করবে। ছাত্রেরা ভাবতে শিখবে। তারা হয়ত যে সব রাজনৈতিক নেতা এইপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করেছেন তাদের প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। শিক্ষার, তা সে শিক্ষা-ব্যবস্থার ধরন যে রকমই হোক, কিছুটা নিজস্ব গতিময়তা থাকবেই।

তথাপি এ কথা মানতেই হবে যে রাজনীতি স্থাপত্যবিদ্যাসুলভ (Architectonic) বিজ্ঞান। সম্প্রদায় কি চায় সে সম্পর্কে সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়।

এই অর্থে, "শিক্ষা" বলতে এই প্রবন্ধে এমন একটি মান অথবা নিরিখকে বোঝান হয়েছে যার দ্বারা কোনো একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার করা যায়।

সূচীপত্র

১. অবস্থাচক্র

শিক্ষা এখন স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারে

শেষ পর্যন্ত একুশ শতকে শিক্ষাব্যবস্থা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে হাত। এতকাল যাবত এই ব্যাপারটি রাজনীতি, অর্থনীতি, কারিগরি কলাকৌশল এবং সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে এবং ফলতঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে উঠতে হয়েছে। দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি। যে সব দেশ যান্ত্রিক কলাকৌশলগত দিক দিয়ে অনগ্রসর রয়ে গেছে সে সব দেশের বেশীরভাগ লোককে সারা দিনমান কাজ করে কাটাতে হয়েছে। স্কুলে যাওয়া, পর্যবেক্ষণ করা, পড়াশোনা, এমনকি চিন্তা করার সুযোগ-সুবিধাও পায়নি তারা। সামাজিক ব্যবস্থাটি ছিল শ্রেণীনির্ভর। সমাজের নীচু শ্রেণীর কোনো যুবক উচ্চ শিক্ষার জন্য আকুলতা পোষণ করবে এটা কেউ ভাবতে পারত না। এমনকি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হতো না। নীচু শ্রেণীর কোনো যুবক যদি আদৌ শিক্ষার্জন করতো তাহলেও তাকে অবধারিতভাবে নিজের সমাজের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখতে হতো।

জার নিকোলাস—১, ১৮২৬ সালে এক মন্তব্য প্রসংগে বলেন যে, "এটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় যে, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার বিষয়সমূহ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এর উদ্দেশ্য, কেউ যেন তার ভাগ্য নির্দিষ্ট অবস্থার উর্দ্ধে উঠতে আগ্রহী না হয়।" জার নিকোলাস—১-এর এই মন্তব্যে তৎকালীন শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল চেতনারই প্রকাশ ঘটেছিল বলা যায়।

বেলজিয়ামের মহান উদারনৈতিক নেতা চার্লস রোজিয়ার 'ecotes moyonnes' উপস্থাপিত করার সময় মন্তব্য করেন যে, এরা "আমাদের নাগরিক এবং শ্রমিকদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখবে। ১৮৯৭ সালে এই শিক্ষালয়গুলিকে "পাঁতি বুর্জোয়াদের সন্তানদে..কে তাদের নিজেদের সমাজের উর্ধ্বে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য ক..ার জন্য"[১] আক্রমণ করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার অদল-বদল ঘটলে এই সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটবে কি-না। এই প্রশ্নের উত্তরে বেশ সতর্কতার সঙ্গেই হ্যাঁ। সূচক জবাব দিতে হবে। আমরা সকলেই জানি বা না জানি, একই মনুষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তনের সূচনা থেকে যে ধরনের গোষ্ঠি প্রীতিসুলভ ঔদার্যের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে এসেছিল এখন আর ঠিক সেইভাবে তা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই অধুনা তুলনামূলকভাবে পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। পৃথিবীর অন্ততঃ কোনো না কোনো অংশে আমরা শ্রমহীন সমাজের পত্তন ঘটাতে পারি বা না পারি, অধিকাংশ জনসমাজই যে অধিকতর সময় শ্রমহীনভাবে যাপন করতে সক্ষম হবে এ কথা যুক্তি-যুক্তভাবেই বলা যায়। শ্রেণী-নির্ভর সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। এখন আর কোনো ছাত্রকে তার নিজের শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবটা স্বাভাবিকভাবে রাখা যাবে না।

সার্বজনীন, ব্যয়হীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা এখন প্রত্যেক দেশেরই বিঘোষিত উদ্দেশ্য। শিক্ষার্জনের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে এখন আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে।

শিক্ষা সম্পর্কে নতুন উৎসাহের কারণসমূহ

বিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে শিক্ষাই সমস্ত রাষ্ট্রের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠছে দেখা যায়। এক সময় এটা ছিল ধনী দেশ-সমূহ এবং ব্যক্তিবর্গের বিলাসিতা—নাগরিকদের তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের

নির্দিষ্ট স্থিতির জন্য গড়ে তোলার একটি উপায়। অথবা, ন্যূনপক্ষে, কাজের উপযোগী না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তাদের তদারকির ব্যবস্থা। কিন্তু কালক্রমে শিক্ষা যুগপৎ ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বলে বিবেচিত হতে থাকে।

শিক্ষার অধিকার কথাটি এসেছে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে, প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়ার অধিকার থাকা উচিত এই ধারণা থেকে। শ্রমবিনিয়োগ এবং কাজ করার অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে তা-ও এর প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষার্জন এবং তার শ্রমবিনিয়োগ-উপযোগিতা ও আয়ের পরিসংখ্যান-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হলে দেখা যাবে কাজ করার অধিকারই শিক্ষার্জনের অধিকারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এই বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, শিক্ষাই বাঞ্ছিত ও উন্নতিশীল জীবনের একমাত্র পাথেয়। ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এটাই পিতামাতার অনুসৃত জীবনধারা থেকে তার উত্তরণের ছাড়পত্র ছিল। তার পিতামাতা ছিলেন ভাল চাষী—সেখান থেকেই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনি।

শিক্ষা রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে; কেননা এর দ্বারাই প্রাচুর্য ও শক্তি অর্জন সম্ভব বলে মনে করা হয়েছে।

এটা এমন কিছু নতুন ধারণা নয়। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে শিক্ষার ইতিহাসের উপরে যে নিবন্ধ লিখিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "১৮৬৬ এবং ১৮৭৩ সালের যুদ্ধগুলি ছিল প্রুশিয়ার স্কুল-মাস্টারদের বিজয়। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।" কিন্তু জনশিক্ষার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। আগে কিছু সংখ্যক সরকার ও মানুষের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল—কিন্তু বর্তমানে সব সরকার এবং জনগণই এই মতের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বি. জনসন ব্যবসায়ীদেরকে শিক্ষাখাতে অর্থ বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে বলেন। তিনি বলেন, এই খাতে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক হবে।[২] তিনি উল্লেখ করেন যে, একজন কলেজ গ্রাজুয়েট তার জীবনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাইতে গড়ে ৩০০,০০০ ডলার বেশী আয় করতে পারবে। সচ্ছল নাগরিক মানেই সচ্ছল দেশ। সম্ভবতঃ এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই ধারণাটি যে, শিল্প এবং কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতি শিক্ষার প্রসারের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। স্বাক্ষর লোকের সংখ্যা যত বেশী হবে, শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে শিল্প, কারিগরি এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পাবে।[৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের গুণপনা জাহির করার পর এই ধারণাটি আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

অবশ্য এই একই ধারণা এই বিশ্বাস উৎপাদনেও সহায়ক হয় যে, শিক্ষাই জাতীয় শক্তি অর্জনের অন্যতম উপায়। বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার উপরই শিল্প-শক্তি ও নতুন ধরনের অস্ত্র উৎপাদন নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়।

১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডী কংগ্রেসে প্রেরিত এক বাণীতে এই চলতি মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

জাতি অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, এ বাবদে অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রের চাইতে শিক্ষাখাতে লগ্নী করাই সবচেয়ে বেশী লাভজনক। গত ক'বছরে জাতীয় আয় ও উৎপাদনের শতকরা চল্লিশভাগ এই ক্ষেত্র থেকেই আহরিত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং মহাশূন্যবিষয়ক গবেষণার এই নতুন যুগে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য হাসিল ও শক্তি-বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই বিবেচনাই প্রাগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে কর্মতৎপর করে তোলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নতশীল দেশগুলি

নিজ নিজ সরকার কায়েম করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় সব ধরনের সরকারী দফতর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই দেশগুলির অধিকাংশই যেহেতু যত দ্রুত সম্ভব শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং যেহেতু শিক্ষাই শিল্পায়নের প্রথম চাবিকাঠি বলে বিবেচিত হয়, সেইহেতু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দেশগুলি তাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারে বাধ্য হয়।

পরিবর্তনের হারজনিত সীমাবদ্ধতা

কোন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা কি ধরনের বস্তুসমূহ সরবরাহ করবে? তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কাজে লাগবে এমন কিছু এর দ্বারা সরবরাহ করা সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থার প্রতিকার এই মুহূর্তে এর দ্বারা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক শ্রম সচিব (সেক্রেটারী অব লেবার) একবার বেকারত্ব নিরোধের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, স্কুল ত্যাগের বয়সসীমা ১৬ থেকে ১৮ বছরে উন্নীত করা হোক। এর ফলে শ্রম-বাজার থেকে ২০ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ভবন এবং আসবাসপত্র ছাড়াও প্রায় ১০০,০০০ নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। এই ধরনের বিপুলসংখ্যক কর্মী নির্বাচন এবং তাদেরকে কর্মোপযোগী করে তোলা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হলে তা যথেষ্ট দুঃসহ ব্যাপার বলেই প্রতীয়মান হতো সন্দেহ নেই।

প্রয়োজনীয় ভবন, আসবাসপত্র এবং যথোপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও যে কর্মসূচীটি ছয় অথবা সাত বছর বয়সকাল থেকে শুরু করা হয় তার 'ফলাফল' অন্ততঃ দশ বছরের আগে পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয় না এবং ছাত্ররা পরবর্তী জীবনে কি হলো না হলো তার উপরই সমগ্র পরীক্ষাটি নির্ভরশীল, সেই হেতু কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করেছে সেটা কেবল পঁচিশ বছর পরেই জানা সম্ভব।

এ ছাড়া দূরবর্তী সময়ে কোন্ বস্তুগুলির চাহিদা থাকবে তা নির্ধারণ করার জটিলতাও রয়েছে। দূরবর্তী সময়ে কোন্ বস্তুটির প্রয়োজন হবে তা আমরা জানব কেমন করে? সাধারণভাবে এই প্রশ্নের একটি উত্তর দেওয়া যায়ঃ উদাহরণতঃ বলতে পারি যে, অধিকতর ক্ষমতা ও প্রাচুর্যই আমাদের কাম্য। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছর পর ক্ষমতা ও প্রাচুর্য অর্জনের পন্থা কি হবে তা আমরা কেমন করে নির্ধারণ করব? ১৯০৬ সালে কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারত যে ১৯৪৬ সাল নাগাদ বিজ্ঞান এবং কারিগরি জ্ঞানই শক্তি ও প্রাচুর্য অর্জনের পন্থা বলে স্বীকৃতি পাবে? ১৯০৬ সালে জমি ও মানুষকে ব্যবহার করেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যেত।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং আফ্রিকা পৃথিবীর উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে একটি বিষয়েই স্থিরনিশ্চিত হওয়া গেছে, তা হচ্ছেঃ কোন দেশের 'প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি' সম্পর্কে আগে থাকতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নেও যেখানে ভবিষ্যদ্বক্তারা এমনভাবে কথা বলেন যেন তাঁরা এটা বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম, সেখানেও পরিকল্পনাবিদ্‌রা শিক্ষা এবং জীবিকাকে এক সূত্রে গাঁথতে পারেননি। চলতি সময় থেকে পাঁচ-দশ বা পনেরো বছর পর প্রয়োজন হবে এমন চাহিদার কথা ভেবে শিক্ষাবণ্টনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা। সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রায়শঃ যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয় তার উদ্ভব হয়েছে চাহিদা ও সরবরাহের এই অসামঞ্জস্যতা থেকেই। ১৯৫৯ সালে ক্রুশ্চেভ মন্তব্য করেন, 'জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় কত সংখ্যক এবং কোন্ ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করার নির্ভরযোগ্য কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আমাদের জানা নাই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে এবং কখন সেই প্রয়োজন দেখা দেবে তা-ও আমাদের জানা নেই।[৪] 'পশ্চিমে প্রকাশিত তিনটি স্বাতন্ত্র স্বাধীন সূত্রের বিবরণীতে জানা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে

শ্রম-শক্তি বিনিয়োগ সম্পর্কীত ভবিষ্যদ্বাণী এখনও নির্ভুল হতে পারছে না।

এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে পরিবর্তনের হার। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেটি দূরীভূত হয়ে যেতে পারে। বহুদিন পরে বা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এমন বিষয়ের কোনো স্থিরতা নেই। তার কারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

সমাজ যত প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর হয়ে উঠবে, শিক্ষা তত কম উদ্দেশ্যমূলক হবে। এর কারণ হচ্ছে সমাজ যত প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর হয়ে উঠবে, এর বিবর্তন ঘটবে তত দ্রুত। এর ফলে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার গুরুত্বও তত হ্রাস পাবে। এখন এ কথা নিঃসংকোচেই বলা যায় যে, সবচেয়ে বাস্তবধর্মী শিক্ষা হলো সবচেয়ে বেশী তত্ত্বনির্ভর।

নতুন উৎসাহের ফলাফলসমূহ

বিশ শতকের ষাট দশকে এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে অনেকাংশে অস্বীকার করা হয়েছে। স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত শুরু হলেই আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যাবে এই নতুন বিশ্বাসটি সারা দুনিয়ার সমগ্র জনগণের মনে দ্রুত বিস্তারলাভ করেছে। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ব্যাপক হারে যোগদান এবং সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যানুপাতিক বৃদ্ধি এই বিশ্বাসের জলজ্যান্ত প্রমাণ। কোনো কোনো বিশেষ এলাকায় এ ব্যাপারে ঔদাসীন্য এবং উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হলেও, যেমন দেখা গিয়েছে ফ্রান্সের কৃষক এবং কারিকর মধ্যে, সাধারণতঃ পিতা মাতারা নিজেরা যতদূর শিক্ষা লাভ করেছেন ছেলে-মেয়েদের তারচেয়ে বেশী শিক্ষা প্রদান করতে আগ্রহী বলেই লক্ষ্য করা গেছে।[৫] তারা নিজেরা যে সমস্ত শিক্ষায়তনে প্রবেশের সুযোগ পাননি সেইসব শিক্ষায়তনে তাঁদের ছেলে মেয়েদের প্রবেশাধিকারও দাবী করেছেন। একই সময়ে, সরকার এবং দাবীগুলির

সহৃদয়তা সহকারে বিবেচনা করতে থাকেন। সরকারের এই সহৃদয়তার কারণ শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্যের অন্বয়িত একটি সম্পর্ক রয়েছে, যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

বিশ শতকের ষাট দশকে সারা পৃথিবীতেই এই ব্যাপারটি ঘটে চলেছিল। পশ্চিমের প্রাগ্রসর শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে এই স্রোত শত শত বর্ষের সাধনায় গড়ে তোলা কাঠামো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনাও দেখা দেয়। উন্নয়নগামী দেশসমূহে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান, সম্পদের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রেখে করা হয়। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমা দেশসমূহের মত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া হবে কি-না তা ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হবে। এই সমস্ত দেশে মানুষের শিক্ষার প্রতি ঝোঁক খুবই কম। আবার উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্খা কিছু লোকের মধ্যে থাকলেও শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ।[১]

২. কার কোন্ ধরনের শিক্ষা পাওয়া উচিত ?

সবচেয়ে বড় সমস্যা : সকলকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো প্রত্যেককে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। পৃথিবীর মানুষকে আর কখনও এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি। কিন্তু এখন আর এই সমস্যাটিকে এড়ান সম্ভব হবে না।

শত শত বৎসরব্যাপী কোনো একটি শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিকরণের উপযোগিতা পরীক্ষা এবং ওই ব্যবস্থার অধীনে উন্নতির পরিমাণ ওই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই নির্ণীত হতো। ভর্তির জন্য যোগ্যতাও ওই ব্যবস্থাপনার দ্বারাই নির্ণীত হতো। শ্রেণীবিভক্তি এবং পাঠ্যতালিকা নির্ধারণের ব্যাপারেও এই ব্যবস্থাপনার উক্তিই ছিল শেষ কথা।

কিন্তু সবাই যদি স্কুলে যেতে চায় তাহলে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক স্কুলে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সবাইকে যদি শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে স্কুলের প্রতি যাতে কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং স্কুল যাতে তাকে ধরে রাখতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি এবং একমাত্র চাবিকাঠি, এই ধারণা প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে ভেদ-চিহ্ন ভেঙে যাবেই। কেননা, সুখী এবং কর্মতৎপর হওয়া থেকে কে-ই বা বঞ্চিত থাকতে চাইবে ?

পশ্চিমা জগতে শত শত বৎসরব্যাপী এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে গেলে কারুরই শিক্ষালাভ ঘটবে না : এই কর্মকাণ্ডটি এত বিরাট এবং ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কে এত বেশী জটিলতা দেখা দেবে যে, যে কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য কর্মসূচিতে শৈথিল্য প্রকাশ পাবেই। সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার চাপ

অনিবারণীয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল সমস্যার মোকাবিলার জন্য এক ধরনের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। স্বল্পকালীন সাধারণ শিক্ষার পর একের জন্য 'বাতিল পরীক্ষার' ব্যবস্থা করা হয় এবং যারা শিক্ষাগত দিক দিয়ে উন্নত নয় তাদেরকে অন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। একই স্কুলে অনুন্নত ছাত্রেরা যাতে উন্নত ছাত্রবর্গের শিক্ষার পথে বিঘ্ন না হয়ে দাঁড়ায় সে জন্য 'বিশেষ ব্যবস্থা' গৃহীত হয়। যে সব ছাত্র, টমাস জেদারসনের ভাষায় 'শারীরিক পরিশ্রমের উপযোগী' তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পাঠ্যপ্রণালী চালু করা হয়। এইসব ছাত্রদের নিকট বৃত্তিমূলক শিক্ষা অধিকতর সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হবে বলে ধারণা করা হয়।

শ্রেণী এবং যোগ্যতা

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই কলাকৌশলগত। সমাজ যে রকম চায় ঠিক সেই রকম 'বস্তু' উৎপাদন করাই এদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি যে, যারা এই ব্যবস্থাপনার অধীনে থেকে সাফল্য অর্জন করে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে সাফল্য অর্জন করেছে অথবা ওই বিশেষ ব্যবস্থাটিই তাদের মত লোকের জন্য তৈরী করা হয়েছে অথবা, তাদের নিজস্ব কোনো 'সামর্থ্য' আছে।

অ্যারিস্টটলের সুবিখ্যাত সিদ্ধান্ত অনুসারে সব মানুষই প্রকৃতগতভাবে জানতে উৎসুক। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গবেষণায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, জানবার ক্ষমতার সঙ্গে এই ঔৎসুক্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষার প্রতি এই নতুন উৎসাহের ফলে বহু নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই নিরীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য ছিল কে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং তা কোন হারে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধিত হয়নি এমন প্রতিটি ছেলেমেয়েই মৌলিক বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারে। এর দ্বারা এটাও

নির্ধারিত হয়েছে যে, প্রতিটি বিষয়েই যেরূপ ধারণা করা হয় তার চেয়ে কম বয়সে শিক্ষাদান করা সম্ভবপর। এই নিরীক্ষার ফলে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, মানবজাতির কোনো সদস্যই শিক্ষা গ্রহণের অনুপযোগী নয়।[১]

রেনে ডুবো[২] বলেছেন, তাঁর বিচারে, মানুষের প্রজনন সম্পর্কীত বিষয়ে সম্প্রতি যে উল্লেখযোগ্য অধিকার ঘটেছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের জন্মগতভাবে লব্ধ ক্ষমতার খুব সামান্য অংশ শতকরা ২০ ভাগেরও কম কার্যকরভাবে প্রকাশ পায়। বেশীরভাগ মানবশিশুই নিস্পেষণের চাপে অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরিবেশই জন্মপ্রাপ্ত মানবশিশুর কোন্ দিকটি স্ফুরণ লাভ করবে আর কোন্ দিকটি নিস্পেষিত হবে তা নির্ধারণ করে।

আমরা অবশ্য কোমেনিয়াস এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি :

কেউ যেন এ কথা না ভাবেন যে, আমরা প্রতিটি মানুষকে শিল্প এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিবিড় জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে পেতে চাই। এটাতে কোন লাভজনক ফল পাওয়া যাবে না। আয়ুর স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এটা কোনো মানুষের পক্ষে অর্জন করাও সম্ভব নয়। কেননা আমরা জানি যে প্রতিটি, বিজ্ঞানই এত ব্যাপক এবং জটিল যে, সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সারাজীবনের সাধনাতেও এটিকে পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আমরা চাই প্রতিটি মানুষ মূল সূত্রগুলি, তার কারণসমূহ এবং পার্থিব বস্তুগুলির ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করুক। কেননা, আমাদের কঠিন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কোনো মানুষই জীবনের পথে পাড়ি দেওয়ার সময় এমন কোনো কিছুর সম্মুখীন না হয়, যার সম্পর্কে সে তার সুষ্ঠু মতামত জাহির করতে অক্ষম। সে যাতে কোনো সাংঘাতিক ভুল না করে যে কোনো বস্তুকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধান করাও আমাদের কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন যে, কোনো কোনো মানুষের বুদ্ধি এতই কাঁচা যে তাদের পক্ষে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব

নয়। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে, এমন আয়না পাওয়া খুবই দুষ্কর যে আয়নায় কোনো না কোনো ধরনের ছবি ফুটে ওঠে। কিংবা কোনো প্রকার দাগ কাটা যায় না এমন প্রস্তরখণ্ডও পাওয়া খুবই কঠিন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষা

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক না কেন, এই ব্যবস্থার ফলাফল থেকে আমরা সকলেই যে একটি শিক্ষা লাভ করেছি তা জানতেই হবে। মাত্র কিছু সংখ্যক লোক জটিল বিষয় অনুধাবনে সক্ষম, সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ১৯৫৯ সালে প্রচলিত শিক্ষা আইন অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাত থেকে পনেরো বছর বয়স সীমার মধ্যে প্রতিটি ছাত্রের জন্য অঙ্ক, শারীরবিদ্যা এবং জীববিদ্যা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাদেরকে অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে ছাত্রদের ব্যর্থতা অথবা স্কুল ত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না বলা যায়। তবু অনুৎসাহী অথবা বিদ্বেষপরায়ণ পর্যবেক্ষকগণ যে সব মন্তব্য করেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পশ্চিমা দেশগুলির মান অনুসারে, এসব বিষয়ে ওরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

এ ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন কোথা থেকে শুরু করে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে তা জানার পর আমাদের নিজেদের জাতি সম্পর্কে আমরা শঙ্কাকুল না হয়ে পারি না। সোভিয়েট ইউনিয়নে এককালে শুধু মধ্যবিত্তরাই ওই জাতীয় শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী ছিল। ভাল ভবনগুলি উৎখাত করার পর তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি বিরাট দেশ, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বসবাস এখানে, তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিও বিভিন্ন। নিরক্ষর লোকের সংখ্যাও ছিল অগণতি—কোন কোন এলাকায় শতকরা একশ' ভাগ। এ সত্ত্বেও শিক্ষা

ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাকে বিস্ময়কর ছাড়া আর কোনো বিশেষণে অভিহিত করা যাবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে তা অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে আফ্রিকার বান্টুদের বা হারলেম অথবা মিসিসিপির অধিবাসীদের মধ্যে ওই কর্মসূচী চালু করার কথা ভাবলেই চলবে। কম্যুনিষ্ট চীন এ ব্যাপারে যতদূর সাফল্য অর্জন করেছে এই মুহূর্তে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু নানা সূত্র থেকে যে সমস্ত ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারাও এটা প্রমাণ করতে পারবে যে প্রত্যেকেরই তার মস্তিষ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা আছে।

পরিবেশ এবং বিদ্যার্জন

মাত্র কিছুসংখ্যক লোকই শিক্ষার্জন করতে পারে পুরোন আমলের এই বিশ্বাসটি গড়ে উঠেছিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। কোন মানুষের জাতি, বর্ণ, সামাজিক মর্যাদা, ঐতিহ্য বা জাতীয়তা থেকে এই ধারণার উদ্ভব ঘটেনি। বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সীমাবদ্ধ সম্পদ নিজেদের একচেটিয়া এখতিয়ারে রাখার ফলে এটা ঘটেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যাদের পৃষ্ঠপোষকতা করাটাকে লাভজনক মনে করতো তারাই শুধু এই সুযোগ পেত। এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, অবসর যাপনের মতো শিক্ষাতেও মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকেরই অধিকার আছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলা হতো যে, কেবল কিছুসংখ্যক লোকেরই এর দ্বারা লাভবান হবার সামর্থ আছে।

এই যুক্তির মধ্যে গ্রাহ্যনীয় কিছু আছে বটে, কিন্তু এই যুক্তির প্রবক্তারা যে অর্থে বলতেন সে অর্থে নয়। এই যুক্তির উপসংহারে বলা হয় যে, কিছু লোকের মানুষের মত গড়ে ওঠার ক্ষমতা আছে

আর অন্যদের তা নেই। এক অর্থে ব্যাপারটা সে রকমই বটে। নবজাত সন্তানকে মানুষ যে পরিবেশে রাখে সেটার উপরই তার মানুষ হওয়া নির্ভর করে। শিশু এবং বয়স্করাও নিষ্ঠুর পরিবেশে জীবনযাপন করলে নিষ্ঠুর হয়েই গড়ে ওঠে। এ সংক্রান্ত নানান সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে এই ধরনের পরিবেশে এবং তাতে যদি জীবনের শুরুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়—মানসিক উৎকর্ষ ব্যহত হয়। বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের যদি স্কুলে যাওয়ার বয়সকালে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া না হয় তাহলে সারাজীবনেও সে তার বস্তিজীবনের প্রভাব বর্জন করতে পারবে না। পরিবার এবং প্রতিবেশ স্কুলে যাওয়ার আগেই শিশুর জীবনে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

বস্তিবাসী ছেলেরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেলেও কদাচিৎ নিজেকে সেখানে মানিয়ে নিতে পারে। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা কমিশনার (ইউ. এস, কমিসনার অব এডুকেশন) নিউ ইয়র্ক শহরের নিগ্রো বস্তিগুলি সম্পর্কে উক্তি প্রসঙ্গে বলেন:

সেণ্ট্রাল হার্লেসের তৃতীয় গ্রেডের ছাত্ররা নিউইয়র্কে সিটির অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় সাফল্যের বিচারে পূর্ণ এক বছর পিছিয়ে ছিল। ষষ্ঠ গ্রেডে পৌঁছান পর্যন্ত তারা প্রায় দু'বছর পিছনে পড়ে যায়; অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত প্রায় তিনবছর...পরীক্ষার দ্বারা এবং আই. কিউ (I. Q.) থেকে জানা যায় যে, সেণ্ট্রাল হার্লেসে শিক্ষার দারুণ অবগতি ঘটেছে। যে ছাত্র যত বেশীদিন স্কুলে কাটিয়েছে সে প্রচলিত মান এবং তুলনামূলক শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে তত বেশী অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। অষ্টম গ্রেডে পৌঁছানোর পর ক্ষতিটা অপূরণীয় হয়ে পড়েছে এবং তারপর গ্রহণযোগ্য গ্রেড মান অর্জন করা আর সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্প আশা করলে স্বল্পই অর্জন করা যায়। শিক্ষকবর্গ, যারা সচরাচর বস্তি এলাকা থেকে আসেন না, সাধারণতঃ এই এলাকার ছাত্রদের কাছ থেকে খুব বেশী একটা কিছু আশা করেন না।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করবেন যে, ওরা স্কুলে তেমন ভালো ফল করতে পারবে না—তার এই ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়। ইংলণ্ডের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছেলেদের 'বাছাই' করা নিয়ে এক গবেষণা চালান হয়। এই গবেষণায় দেখা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরাই শুধু তাদের যোগ্যতার চেয়েও বেশী হারে 'বাছাই' করাদের শীর্ষ তালিকায় স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেরা 'বাছাই' করাদের নীচু ধাপে তো থেকেইছে; উপরন্তু পাঁচ বছর বয়সে তাদের মধ্যে যে উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এগারো বছর বয়সে তা অনেকাংশেই খর্ব হয়েছে।[৩]

শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে নাটকীয় দিক হলো উদ্যম এবং তার ফলাফলের মধ্যেকার অসামঞ্জস্যতা। এই ফলাফল এবং অসামঞ্জস্যতা এতই নাটকীয় যে, গীব্‌ন এতদ্‌সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে বলেন, "প্রয়োজনাতিরিক্ত সুখী পরিবেশে পরিবেশন না করলে শিক্ষা প্রদান কখনও নিশ্চিত ফলদায়ক হয়ে ওঠে না।" শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবেশ, পরিবার, সমাজ, নীতি-নিয়ম, যোগাযোগের মাধ্যম, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এক কথায়, সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে। অতীতে সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলতে পারত। এর কারণ তারা যে পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত সে পরিবেশ থেকে তারা শিক্ষার জগতে আসার পথে তাদেরকে বিশেষ কোনো অভিযানের মুখোমুখি হতে হতো না। উদাহারণতঃ বলা যায়, ইউরোপের সর্বত্র শিক্ষা ব্যবস্থার মূল প্রচেষ্টাই ছিল বাছাই করা সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে জীইয়ে রাখা, এর চূড়ামনি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। জনসাধারণের বেশীরভাগ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল অথবা তাদেরকে শুধু বৃত্তিগত শিক্ষাই দেওয়া হতো। কিংবা তা-ও দেওয়া হতো না। ১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের শতকরা ৭৭ ভাগ স্কুলগামী ছাত্রকে ১১ বছর বয়সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে চারিত করা হয়। ইংলণ্ডে বাছাই করা পদ্ধতি সার্বজনীন

ক্ষেত্রে অনুসৃত না হলেও এ থেকে একটি ফললাভ ঘটেছিল। এর ফলে নীচু মানের ছাত্ররা সাত বছর বয়সকালেই বুঝতে পারত যে, তাদের কাছ থেকে খুব বেশী একটা কিছু আশা করা হয় না। নীতিগত-ভাবে প্রতিটি দেশেই এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বা এক ধারা থেকে অন্য ধারার পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ছাত্রের অতি স্বল্প সংখ্যকই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারত।

সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার দাবী বর্তমানে সমান সুযোগের দাবীতে পরিমিত হয়েছে। পশ্চিমের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি এই দাবী স্বীকার করে নিয়েছে বলেই মনে হয়। 'বাতিল পরীক্ষা' উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা শিথিল করা হচ্ছে। ছাত্রদের মান অনুসারে 'বিভক্তিকরণ' প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং কোনো কোনো দেশে আইনের দ্বারা এটাকে চালিত করা হচ্ছে। ইউনিটে ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষা প্রদায়ী উচ্চতর ইউনিটগুলির ক্ষমতা নিম্নতর লোপ পাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিধারিত পাঠ্যসূচীর সঙ্গে যারা সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না তাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে শিক্ষাব্য-বস্থায় অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। আগামী দিনের মাধ্যমিক স্কুলগুলির লক্ষ্য হবে 'ব্যাপক শিক্ষা প্রদান' ; যার ফলে প্রত্যেকবেই কিছু না কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী এ্যান্থনী ক্রস-ল্যাণ্ড একটি (১৯৬৫) নির্দেশনামা জারি করেন। এতে একাদশ শ্রেণী থেকে উত্তরণ পরীক্ষা বাতিল করে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েল্‌স-এর প্রতিটি ছাত্রকে একই ধরনের মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলি হবে ব্যাপক শিক্ষা প্রদায়ী।

অধুনা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এত সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রের কথা ভাবা হচ্ছে যা এক যুগ আগেও তারা ভাবতে হিমসিম খেতেন। যুক্তরাষ্ট্রে গত দশ বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ইংলণ্ড, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ৩৫,০০০ বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রের আসন নির্দিষ্ট ছিল, বর্তমানে ৬০০,০০০-আসনের কথা ভাবছে।

পিছদুয়ার দিয়ে জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান:

অধুনা কেউই কোনো ছাত্রকে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত করার কথা বলেন না। কিন্তু প্রতিটি দেশের পরিসংখ্যান, এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নও রয়েছে, একই কথা বলে। সেটি হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস অথবা পিতা-মাতার অবস্থার উপরেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ নির্ভরশীল। যে সব ছাত্র সবচেয়ে কম অভিজাত্যের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার শরীক হতে পেরেছে তারাই সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এই অভিজাত যাদের জীবনে যত তীব্র তাদের সাফল্যও তত পরিমিত। এদেরকে বোকা সোকা বলে চিহ্নিত করা হয় এবং আইন অনুসারে যতদূর সহ্য করা উচিত ততটুকুই সহ্য করা হয়। আমরা শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে নাও চিন্তা করতে পারি। কিন্তু আমাদের ধারণা, বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। কিছু মানুষ আছে যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, আবার এমন কিছু মানুষ আছে যাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। সেই অর্থে ভাবলে আমরা এখনও প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তোলার কথা ভাবিনি বলা যায়। শিক্ষার জন্য চাপ এবং তার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপ যতই বৃদ্ধি পাবে এবং এই চাপ নিরোধের ব্যবস্থা যতই ভেঙ্গে পড়বে এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য সমস্যাটি ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যার ফলে 'ভাল বাড়ীর' ছেলেরাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে। সব বাড়ীর অবস্থাই যদি ভাল হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এটা আর কোন সমস্যা বলেই প্রতিভাষ হবে না। কিন্তু ভাল এবং মন্দ সব বাড়ীর ছেলেরাই যদি একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার পায় এবং সবাইকেই যদি এই ব্যবস্থায় বহাল রাখতে হয় তাহলে তাদেরকে গ্রহণ ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করতেই হবে।[৩]

ভাল বাড়ী বলতে বোঝায় যে বাড়ীতে বই আছে, আলোচনার অবকাশ আছে এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা আছে। গরীব ছাত্রদের 'যোগ্যতা' সম্পর্কে যে খেদোক্তি পৃথিবীর সর্বত্র শোনা যায় সেটা তাদের জন্মগত পরিবেশের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। স্কুলের পক্ষে এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া অথবা এই পরিবেশের উন্নতিসাধন করা সম্ভব নয়। স্কুলগুলি শুধু এই পরিবেশগত ত্রুটি যথাসম্ভব ক্ষালন করতে পারে।

গরীব পরিবার এবং খ্যরাপ প্রতিবেশ থেকে আগত ছাত্ররা স্কুলে এক বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়। এই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার ব্যর্থতা তাদের শিক্ষাজবীনে ব্যর্থতা ডেকে আনে। আগেকার দিনে এইসব ছাত্রের স্বল্পবয়সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার অবকাশ ছিল। তারা অতঃপর শ্রম-বাজারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। অথবা তাদেরকে অন্য ধরনের সহজ, গ্রহণযোগ্য এবং অধিকতর বাঞ্ছনীয় শিক্ষাপ্রণালী আয়ত্ব করার সুযোগ দেওয়া হতো যাতে আইন সম্মত বয়সকালে পৌঁছান পর্যন্ত সে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। বর্তমানে সবদেশে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দাবী উত্থাপিত হওয়ার ফলে এই নিদান কার্যকরি করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দেশেই, কলাকৌশলগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোন কোন দেশে বেকারত্বের হার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই দেশগুলিতে স্কুলে শিক্ষালাভের পরিবর্তে, কাজে যোগদান করার তরুণদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

স্কুল ত্যাগের বয়স

যে ব্যক্তি যত বেশী শিক্ষা পাবে তার অবস্থা তত ভালো হবে এটাই সামগ্রিকভাবে সকলের ধারণা। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তরুণেরা যত বেশীদিন স্কুলে শিক্ষালাভ করতে পারবে তাদের

তত্ত্বেশী উপকার সাধিত হবে। একটিমাত্র প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এ প্রসংগে। সেটা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে তরুণদের বেশীদিন শিক্ষা দেওয়ার খরচ বহন করা সম্ভব কি না। এই অসুবিধাটির কথা বিবেচনা করেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন দ্বারা আপিল হয়ে ১৯৬৪ সালে স্কুল ত্যাগের বয়স ষোলোতে উন্নীত করেন। এই বিধানে অবশ্য পরিবর্তনটি কার্যকরী করার সময় ১৯৭০ সাল বলে নির্ধারিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে ব্যবস্থাটি আর্থিক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা প্রয়োজনানুগ শিক্ষা যোগান দেওয়া যাবে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকার জন্যই এই লক্ষেপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঁচ বছর বয়সকালে প্রতিটি ছেলেমেয়েই স্কুলে যেতে চায়। পনেরো বছর বয়সে এদের অনেকেই স্কুলত্যাগ করতে অভিলাষী হয়ে ওঠে। এই স্কুলত্যাগীর সংখ্যা ইদানীং এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এই বিশেষ সমস্যাটির উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বহু গ্রন্থ লেখা শুরু হয়েছে। এই বইগুলিতে বহুকাল আগে স্যার রিচার্ড লিভিংষ্টোন স্কুল ত্যাগের বয়সসীমা বর্দ্ধিত করার বিরুদ্ধে যে মতপ্রকাশ করেছিলেন তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। স্যার লিভিংষ্টোন সংস্কৃতির মানের উন্নতিকল্পে শিক্ষা-বয়স বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কয়েকজন লেখক, যথা যুক্তরাষ্ট্রের লুইস এ ডেক্সটার এবং পল গুডম্যান ও যুক্তরাজ্যের ফ্র্যাঙ্ক শাসনগ্রোভ স্কুলে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যর্থতা দেখে এত বেশী মর্মাহত হয়েছেন যে, তারা বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা বিলোপের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। সমস্যার প্রতিকার মূলসমস্যার চেয়ে অধিকতর জটিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষা এবং পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা দেখাতে সমর্থ হই যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা সামাজিক হিতের কারণ স্বরূপ ছিল। এই ব্যবস্থার ব্যর্থতার অবসান ঘটাতে হলে এটাকে আবার ঠিকমত চালু

করতে হবে। সেটা কি ভাবে করা সম্ভব তা আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে 'উদারনৈতিক' শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার সময় নির্দেশ করব।

'ড্রপআউটস' [স্কুল-ত্যাগী ছাত্র]

শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলিতে যেখানে বেকারত্ব আছে, সেখানকার সবচেয়ে সামাজিক বিন্যাস এবং শিক্ষা ব্যবস্থার দুঃখজনক দিক হলো 'ড্রপআউটস' বা সেইসব তরুণ ছাত্র-ছাত্রী যারা যত দ্রুত সম্ভব পড়াশোনা ত্যাগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ছাত্রের শতকরা পয়ত্রিশভাগ স্নাতক শ্রেণীতে উত্তরণের পূর্বেই উচ্চ বিদ্যালয় ত্যাগ করে।

এ হেন পরিস্থিতিতে স্কুল-ত্যাগের বয়স বৃদ্ধি করার অর্থ অতিরিক্ত শতক। পয়ত্রিশ জন ছাত্র ছাত্রীকে জেলবাসের শাস্তি প্রদান করা। ১৯৬২ সালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণ ক্যারোলিনার গ্যাদনি থেকে প্রেরিত এই সংবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

"Four youths appeared in General Sessions Court in connection with a series of break-ins Judge Frank Epps, learning that they had quit School, gave them the choice of returning to school or going on the chain gang. Without hesitation, all four chose the chain gang."[৬]

পুত্রের উপার্জন ব্যতীত পিতা-মাতার সংসার অচল হয়ে পড়ে শুধু এই কারণে কোনো উৎসাহী ও যোগ্য ছাত্রের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাক এটা কোনো মতেই স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে না। স্কুল-ত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় এই কারণে যে, তাদের রোজগার করার ক্ষমতা নেই। স্কুল-ত্যাগ করার ফলে তারা নিজেরা অথবা তাদের পিতা-মাতারা কেউই উপকৃত হবেন না।

ছাত্রদের কাছে একটিই মাত্র নিবন্ধ জানান হয়েছে। সেটি হচ্ছে, স্কুলে থাকলেই তারা শিক্ষালাভ করতে পারবে। তারা যদি বেশ কিছুদিন স্কুলে শিক্ষালাভ করে তাহলে তারা কাজের উপযুক্ত হয়ে

উঠবে। এই যুক্তির পিছনে আছে শুধু পরিসংখ্যানের সমর্থন—কোনো একজন ছাত্র এটাকে তার জীবনে কার্যকর বলে নাও ভাবতে পারে। তা ছাড়া, শিক্ষার সঙ্গে চাকুরীর কোনো সরাসরি সম্পর্ক কখনই স্থাপিত হয়নি। আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল পরিবারের ছেলেদের তুলনায় বেশীদিন স্কুলে কাটায়। কিন্তু বেশীদিন স্কুলে থাকার ফলেই তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল অথবা অধিকতর সচ্ছল পরিবারের ছেলে বলেই তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তা অদ্যাবধি স্থির করা সম্ভব হয়নি।

চাকুরী বিনিয়োগে মন্দা দেখা দিলে শিক্ষাব্যবস্থা চাকুরীজীবী তৈরী করার ব্যবসায়ে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানে প্রচুর সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল, জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী প্রার্থীদের শিক্ষামূলক যোগ্যতার মানও বৃদ্ধি পায়। পূর্বে যে সমস্ত চাকুরী প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই একই চাকুরীর জন্য সেকেণ্ডারী স্কুলের স্নাতক-এর মান দাবী করা হতে থাকে। পূর্বে যে সমস্ত চাকুরী মিডল্‌স্কুলের করণিকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এখন সে সব চাকুরীর জন্য কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত চাকুরীপ্রার্থীরাই দরখাস্ত করতে পারে। সমস্ত দুনিয়াব্যাপী এই একই অবস্থা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন হাইস্কুল থেকে যত সংখ্যক স্নাতক ছাত্র প্রতি বছর পাশ করে বেরোয় কোনোকালে যদি তত সংখ্যক ছাত্র কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরোয়, তাহলে এখন যে কাজের জন্য হাই স্কুলের উপাধির প্রয়োজন হয় তখন সেই একই কাজের জন্য কলেজের ডিগ্রীর প্রয়োজন হবে।

কোনো চাকুরীদাতাকে যদি, সবচেয়ে বেশী সময় শিক্ষালাভ করেছেন ও তত বেশী সময় ধরে শিক্ষালাভ করেননি এমন দুজনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হয় তাহলে তিনি খুব সম্ভব যে বেশী সময় শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে তাকেই বেছে নেবেন। বেশী দিন ধরে

লোকেরাই কাজের বেশী উপযুক্ত—এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এই পছন্দ করবেন না। তিনি এই পছন্দটি করবেন তার কারণ, এটাই বাছাই করার সহজতম পন্থা। এই ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে এই ধারণা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যে, যে যত বেশী শিক্ষালাভ করবে তার চাকুরীপ্রাপ্তির যোগ্যতাও তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু স্কুল ত্যাগ করতে ইচ্ছুক যে কোনো ছাত্রের পক্ষে এই ধারণা সর্বাংশে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সে এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে চাইবেই। সে প্রকৃত-পক্ষে, এত বেশী প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যার ফলে প্রতিদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো একটি ব্যবস্থার অধীনে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। বিশেষতঃ, তার পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারটি যখন এতই রহস্যাবৃত।

প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তোলার মার্কিনী সমাধান:

পশ্চিমের সবচেয়ে বেশী শিল্প সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকায় আদায়কৃত করের সাহায্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্য বিশেষ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। এর মোদ্দা কারণ, এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত হবে। একমাত্র ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যই জনগণের অর্থে পরিচালিত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উঁচু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই রাজ্যেও স্কুল-গুলির বেলায় এই বিধানটি কার্যকর করা হয়নি। যে সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী নয় তাদের জুনিয়র ও রাজ্য কলেজগুলিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিশেষ ব্যবস্থাও করেছে এই রাজ্যটি। সহজ কথায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেককে স্কুলে ভর্তি হওয়া এবং যতদিন সম্ভব সেখানে প্রত্যেককে রাখবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন হলো, অন্যান্য দেশসমূহ, যেখানে প্রাচীন প্রথা ভেঙে পড়ছে, সেই দেশ-গুলিতেও কি যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান হবে।

'ভালো ঘরের' ছেলেরা অন্যদের তুলনায় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে

বেশী তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিতে পারে এই ধারণা যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচলিত আছে। যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তাদের বৃত্তি-মূলক শিক্ষা অথবা শ্রম-বাজারে ঠেলে দেওয়া হয়, এটাও। সে হিসাবে বলা চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সবেমাত্র প্রত্যেককে শিক্ষা দেবার প্রশ্নটির মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হয়েছে। যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছে যে, কোনো বিশেষ বৃত্তির জন্য ট্রেনিংদান অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। বেশীরভাগ বৃত্তির জন্য এত স্বল্প ট্রেনিং-এর প্রয়োজন হয় যে, এ জন্য স্কুলে বিশেষ ব্যবস্থা করা অর্থহীন মনে হয়। ১৯৬০-এর দশকে যেহেতু মোট বয়স্ক লোকের হারের তুলনায় বেকারত্ব ছিল দ্বিগুণ সেই হেতু যারা কাজের সন্ধানে স্কুল ত্যাগ করেছিল তাদেরকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

মোটামুটিভাবে আমেরিকায় সমস্যার সমাধান হিসাবে স্কুলে শিক্ষা-গ্রহণের ব্যাপারটিকে শিক্ষামূলক এবং স্কুলে সময় ক্ষেপণের ব্যাপরটিকে বিদ্যার্জনের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে বৃটেনিকা বিশ্বকোষে 'সেকেণ্ডারী এডুকেশন' শীর্ষক নিবন্ধে নির্দেশ করা হয়েছে যে, "আমেরিকায় হাই স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্তির অর্থ এর প্রাপক কতকগুলো নির্দিষ্ট বছর স্কুলে কাটিয়েছেন অথবা বিভিন্ন বিষয়ের ১৪ থেকে ১৬ ইউনিট আহরণ করেছেন।" এই প্রবন্ধ যে সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তার আলোকে এটাকে কোনো শিক্ষাচর্চার অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এর অন্য অনেক গুণাবলী থাকতে পারে—বলা যেতে পারে স্কুলগুলি এক একটি মিলন কেন্দ্র। বলা যেতে পারে, কাজে যোগ দেওয়ার আগে এগুলো ছাত্রদেরকে খারাপ প্রতিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে অথবা স্কুল হচ্ছে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান কিংবা এটা সমাজ-সচেতন করে তোলার কেন্দ্র অর্থাৎ যাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার তাদের এখানে এলে উপকার হয়। ১৯৬৪ সালে সৈন্যবাহিনীর সার্জন জেনারেল ১৮৩, ৫৩৫ সংখ্যক আঠার বছর বয়স্ক কিশোরদের এক সমীক্ষা প্রকাশ করেন।

১ ৪ সালে শেষ প্রকাশিত এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত কিশোরেরা "স্কুলের ছাত্র ছিল না এবং এদের অন্য যে কোনো কাজের জন্য পাওয়া যেত।" এই সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, এদের মধ্যে শতকরা ২৫.৮ জন 'মানসিক' অর্থাৎ কি না শিক্ষাগত কারণে সামরিক বাহিনীতে চাকুরী পাওয়ার অনুপযোগী। যথাক্রমে এই ব্যর্থতার শতকরা হার ওরিগনে ছিল শতকরা ৭৪ এবং উত্তর ক্যারোলিনায় শতকরা ৫৮'৫।

আমেরিকায় মোট ৫০ টি অঙ্গরাজ্য আছে, ৪০,০০০ স্কুল বোর্ড আছে এবং ২০০০-এরও বেশী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এ কারণে এখানকার সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কোনো প্রকারেই সাধারণীকরণ করা যায় না। কেননা, এর মধ্যে অসংখ্য ব্যতিক্রম আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কথা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্তও প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলার সমস্যাটির পূর্ণাঙ্গ সমাধান বের করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্যাটিকে এড়িয়েই গেছে বরং। যে সময় প্রচুর সংখ্যক চাকুরী পাওয়া যেত, সে সময় যে সমস্যাটিকে এড়ান সম্ভবপর হয়েছে এখন এই চাকুরীর অভাবের যুগে সেটিকে আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়—আর কেউ এটা সহ্যও করে না।

প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থাই কোনো না কোনো অর্থে, কিন্তু শুধু এর উপর ভিত্তি করেই এগুলোর স্থায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এগুলো প্রকাশ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। ১৯৬৪ সালে জনৈক বৃটিশ পণ্ডিত লিখেন: "আমাদের স্কুল ও কলেজগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় সে জন্য তাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা উচিত কাজ বলেই মনে হয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রতিটি ইংরেজ পনেরো বছর বয়সকাল পর্যন্ত যে শিক্ষা পান তা তার কোনো কাজেই আসে না। তার শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়—এটা শুধু তাকে রাস্তাঘাটে বেপরোয়া ভাবে চলা থেকে বারিত করে মাত্র।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহের ফলে যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার একটি হলো, যে কোনো সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সাত তাড়াতাড়ি এবং অবহেলার সঙ্গে এটিকে একটি উত্তর হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকাল এ কথা বলা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'এটা তো শেষপর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কীত একটি ব্যাপার।' এটা এক ধরনের নির্লিপ্ততা। সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক শক্তিকে যদি, উদাহরণত ; উৎপাদক ও ক্রেতা তৈরী করার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাকে বোকামী বলেই গণ্য করতে হবে। যেহেতু রাজনীতি একটি আর্কিটেকটোনিক বিজ্ঞান সেই হেতু প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ ঘটবেই। সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য যে ভাঙনের মুখোমুখি হতে হবে তা এড়াবার জন্য এবং চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেকসময় শিক্ষা প্রসঙ্গের অবতারণ করা হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মানুষ পৃথিবীকে বিনাশ করা ও পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে অভিযান চালাবার উপযোগী শক্তি অর্জন করেছে। মানব জাতির ইতিহাসে এই দুটি ব্যাপারই মহাগুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। যে জ্ঞান গরিমার ফলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে তা যদি বিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব জাতি নতুন এক মহান অভিযানের শরীক হতে পারবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি অবিবেচকের মত ব্যবহার করা হয় তাহলে এর ফলে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটতে পারে।

১৯৬২ সালে ব্রিটেনিকা বিশ্বকোষ যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য খ্যাতনামা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করে। এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা একযোগে মতপ্রকাশ করেন যে, যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তন এত দ্রুত হারে সাধিত হচ্ছে যে, এর অভূতপূর্ব এবং অচিন্তনীয় প্রভাবসমূহ নিরূপণও নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য কিছু

ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।[৮] এই সম্মেলন অন্য কোনো উপায়ে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব জ্ঞানে শিক্ষার প্রতিই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেন।

শিক্ষা প্রদান করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সম্মেলনে উপস্থিত পণ্ডিত-বর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সংকট আমাদের মাথার উপরেই ঝুলছে—এবং এই সংকট নিরসনের যে কোনো উদ্যোগ কার্যকরী করার আগেই সংকটটি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করবে। এ ব্যাপারে একমাত্র প্রতিকার হলো আসাব্যঞ্জক কোনো বাণী—যাকে অন্ধ বিশ্বাসও বলা যায়। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কেই নেই। শিক্ষা আমাদেরকে যান্ত্রিক কলাকৌশলের উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা এনে দেবে এ কথা বলার মানে দাঁড়ায়, "আমরা যদি জ্ঞানী হতাম তাহলে আমরা কি করতে হবে তা জানতাম। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে জ্ঞানবান করে তোলা। সুতরাং, আসুন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি।

এই প্রস্তাবটি ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে, বর্তমানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই। জগৎব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয়, ধনসম্পদ ও শক্তি অর্জনই এর মূল উদ্দেশ্য। এই আলোকে বিচার করলে এই ব্যবস্থাপনাগুলির তাৎপর্য হয়ে দাঁড়ায় অন্য রকম। এর মানে দাঁড়ায়, যান্ত্রিক কলাকৌশলগত পরিবর্তন ত্বরান্বিত করার সময় সামাজিক রদবদল সম্পর্কে আদৌ কোনো দৃকপাত না করা। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত ফলটাই প্রত্যাশা করেছিলেন।

যে বা যিনি শিক্ষার মাধ্যমে যুক্তির কথা বলেন তিনি বস্তিগুলি সম্পর্কে কিছু করার প্রশ্নটি স্বতঃই এড়িয়ে যান। যিনি মনে করেন দারিদ্র্য প্রপীড়িত জাতিগুলির মৌল প্রয়োজন শিক্ষা, তাকে ওই দেশের ক্ষুধার্ত জনগণের জন্য উদরান্নের সংস্থান করতে হয় না। শিক্ষাকে যারা বর্ণ সমস্যার একমাত্র সমাধান অথবা চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেন অথবা কিশোর অপরাধ নিবারণের একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করেন এ সব ব্যাপারে প্রায়শঃই তাদের কোনো আগ্রহ

নেই প্রকাশ পায়। এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার কষ্টটুকু তারা স্বীকার করতে নারাজ।

১৯৬০ এর দেশকে পশ্চিমা দেশগুলিতে, অনুন্নত, পশ্চাদ্পদ এবং অব হেলিত অঞ্চলগুলির স্কুলসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ ও শ্রম নিয়োজিত করা হয়। এই উদ্যোগ ছিল যথার্থ এবং মানবিক। প্রতিটি সৎ চিন্তা-শীল ব্যক্তি এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে বাধ্য। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ছাত্ররা যে পরিবেশে বসবাস করে তার উন্নতি সাধন করতেই হবে—তা না হলে এর ফলাফল এত উজ্জ্বল হবে না। নিউ ইয়র্ক শহরের ৪০০ 'প্রাক্তন কিশোর অপরাধিনীকে' শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে যাবতীয় বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় অন্য আর একটি দল, যারা এই বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়নি। তাদের চেয়ে এরা কোনো অংশে ভাল ফল করতে পারেনি। এই মেয়েগুলি যে সাংঘাতিক পরিবেশে লালিত হচ্ছিল সেই পরি-বেশই অপরাধীর জন্ম দেয়।

কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ততদিন স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠে না, যত দিন না সেই দেশের সংস্কৃতির লক্ষ্যও শিক্ষার অনুবর্তী হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক কলাকৌশল আয়ত্ত করার মাধ্যমে শক্তি ও প্রাচুর্য অর্জনই যদি সমাজের লক্ষ্য হয় তাহলে তার পরিণতি জাঁক ইলুই-এর বক্তব্যানুসারী হয়ে উঠবে:

জীবনে শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে হবে। আধুনিক জীবন যন্ত্রনির্ভর। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষাকে সর্বোপরি যান্ত্রিক কলাকৌশলগত হতে হবে... শিক্ষা...ক্রমশঃ বিশেষ ভাবে যন্ত্রবিদ তৈরীর মাধ্যম হয়ে উঠছে। এর ফলে প্রতিটি মানুষ যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ দলের এক একজন সদস্যে পরিগণিত হচ্ছে। বর্তমান উপযোগিতার মান অনুসারে এটাই ঘটছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় অধুনা আর একটি আদর্শ, একটি সচেতন বিবেক অথবা বুদ্ধি-জীবীর দায়িত্ব পালন করবেন না—কোনো প্রকার সমালোচনা-মূলক ক্রিয়া কাণ্ডেও তারা অংশগ্রহণ করবেন না। এরা হবেন অনুগত

ভৃত্য, এদের চেয়ে বংশবদ ভৃত্য আর পাওয়া যাবে না। এরা হবেন যন্ত্রের দাস।...এর ফলে শিক্ষাকে আর মানুষের আলোকায়নের পথে অগ্রগতির মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। শিক্ষা হয়ে উঠবে বৈসাদৃশ্য মোচনের উপায় যন্ত্রসর্বস্ব পৃথিবীতে এবং যে কোনো ব্যবহার-যোগ্য যন্ত্র পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের হাতিয়ার।[৯]

শিক্ষা এবং পরিবার

স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের জীবনে তাদের পারিবারিক জীবনের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আগামী বছর-গুলিতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদেরকে তাদের পরিবারের প্রভাব থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করার আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে। সার্বজনীন, ব্যয়হীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা এই ধরনেরই একটি প্রচেষ্টা। এতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিজয় সূচিত হয়েছে, এই প্রতি-ষ্ঠানগুলি শিশুদের জিম্মাদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং শিশুর জীবনে তার পরিবারের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান শিশুকে তার পারিবারিক আবহাওয়া থেকে যে সময়ের জন্য দূরে রাখতে পারছে শিশু তার পারিবারিক পরিবেশ দ্বারা তত কম 'শোষিত' হচ্ছে।[১০] বর্তমানে যেহেতু শিশুজীবনের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে সেই হেতু সম্ভাব্য অত্যল্পকাল বয়স থেকেই শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা হতে থাকবে। আবাসিক স্কুল, যেগুলিতে আগে শুধুমাত্র বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, এখন সব ছাত্রের জন্যই উন্মুক্ত করা হচ্ছে। এই স্কুলগুলিতে 'সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত' ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে স্থান দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে, যেখানে 'সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত'দের সুবিধা প্রদান ছাড়াও অন্য অনেক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে ক্রেস্ এবং কিণ্ডার-গার্ডেন সহ আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠাকে ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে পিতা-

মাতাই সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র নিয়ন্তা বলে ঘোষণা করা হলেও এবং পরিবারকেই সোভিয়েট জীবনের কেন্দ্র বলে জাহির করা হলেও শিশুকে আবাসিক স্কুলেই দিনযাপন করতে হবে—ছুটির দিন এবং অবকাশ যাপনের দিনগুলি অবশ্য এর মধ্যে পড়ে না।[১১]

আমাদের শিক্ষার বর্তমান ধারা শিশুকে তার বাড়ী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, এমনকি সে বাড়ী 'খারাপ' হলেও, সমর্থন করে না বা এটাকে শিশুর জন্য সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক বলে বিবেচনা করে না। জীবন গঠনে মায়ের স্নেহ ভালোবাসা ও বিশৃংখল পরিবারের প্রভাব সম্পর্কে এখন পর্যন্তও কেউ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। শিশুকে একটি থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আর একটির মধ্যে নিপাতিত করা তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১২] এ প্রসঙ্গে পশ্চিমে বিজ্ঞানভিত্তিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে তার প্রকাশ ঘটেছে ক্রেয়ার এবং ডব্লিউ. এস. এস. রাসেল লিখিত হিউম্যান বিহেভিয়র (মানব আচরণ) নামীয় পুস্তকের উদ্ধারকৃত অংশে।[১৩]

বর্তমানকার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও বংশানুক্রমিকভাবে পারিবারিক সূত্রে বাহিত আচরণ বিধিই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে। এর গুরুত্ব এত বেশী তার কারণ, এতে বিচিত্র ও বিচিত্রমুখীনত হওয়ার সুযোগ নিহিত আছে। প্রগতিবাদী সংস্কৃতি তাকেই বলা যায় যে সাংস্কৃতিতে ছেলেমেয়েকে গড়ে তোলার ব্যাপারে পিতামাতার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতা পড়াশোনার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে। শুধু পিতামাতার আচরণ ছেলেমেয়েদের গড়ে ওঠার পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেই বা বিধ্বংসীকর হলেই এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। এগুলোকেই অতি ব্যবহৃত 'গণতন্ত্র' শব্দটির প্রয়োগের নিরিখ বলে সম্ভবতঃ স্বীকার করে নেওয়া যায়।

পরিবারের গঠন ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে অন্যত্র অবশ্যই আলোচনা করা হবে। আমি বর্তমানে শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, খারাপ

বাড়ী থেকে ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নেওয়ার একমাত্র নিদান হলো তাদের বাড়ীর পরিবেশকে উন্নত করে তোলা। বাড়ীগুলির অবস্থা, শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বলা যায়, শ্রম ঘণ্টা হ্রাস এবং বাড়ীতে শিক্ষা প্রদানের নতুন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যুক্ত সময় এবং টেলিভিশনের সাহায্যে প্রাথিত জ্ঞান বিজ্ঞান পরিবেশন করলে প্রতিটি পরিবারই এক একটি শিক্ষাপ্রদানকারী ইউনিট হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে। এর ফলে বাড়ীতে পিতামাতা এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার্জনের ব্যবস্থাও সম্পন্ন হতে পারে। এটা হয়ত প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সম্ভাবনা আছে।

স্কুলের বিকল্প

ষোলো বছর বয়স্ক কোনো ছেলে যদি স্কুলে না পড়তে চায় তাহলে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করে কোনো ফললাভ হবে না। ব্যাপারটা দিবালোকের মতই পরিষ্কার। কারখানায় বা কৃষি ক্ষেত্রে কার্যে নিযুক্ত হওয়াটাও স্কুলে পাঠ্যাভ্যাসের বিকল্প হতে পারে না। আমরা পরে বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যার্থী সমাজের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করব। এখন শুধু এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, একটি বিশেষ বয়সের পর স্কুলের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা এবং আবার ফিরে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এছাড়া স্কুলে বিদ্যার্জন এবং তার সঙ্গে অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত হওয়াকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হবে না, বরং এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হবে। কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষা দেওয়ার জটিলতার কথা বিবেচনা করেই এটাকে স্বাগত জানান হবে।

যে সব দেশে বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশী সে সব দেশে যারা পড়াশোনা ত্যাগ করে সাময়িকভাবে কাজে লিপ্ত হতে চায়, কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে তাদের কোনো জায়গা হবে না। এ কারণে আমরা সুতরাং আসা করতে পারি যে, বিভিন্ন দেশের সরকার এই সংকট নিরসনের উদ্যোগী হবেন। এই সব সরকার মন্দার যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার

যেমন সিভিলিয়ান কনজারভেশন কোর স্থাপন করেছিলেন সেই ধরনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তরুণদের সুযোগ্যভাবে ব্যবহারের জন্য এই কর্মসূচীটি প্রণয়ন করেছিলেন।

এই পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য

এই পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্য হলো, প্রত্যেককে অবশ্যই শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এবং, এ ব্যাপারে একবিংশ শতাব্দীতে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এর অর্থ অবশ্য এই না যে, প্রত্যেককে একই হারে কিংবা একই উপায়ে অথবা একই পর্যায়ের শিক্ষা দিতে হবে। যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে প্রবেশ করেই একটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির মুখোমুখি হয় তাদের পিছনে অবশ্যই বেশী সময় ও মনোযোগ অর্জন করতে হবে। সবচেয়ে কঠিন আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিও এমন অসম্ভব দাবী করে না যে, প্রত্যেকের অগ্রগতির হার একই প্রকার হতে হবে। যারা অচেনা সংস্কৃতি থেকে আসে তাদেরকে তাদের নিজস্ব পটভূমিতেই বিচার করতে হবে। প্রত্যেককে যদি তার মতামত সচেতন করে তোলাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতি এবং এমনকি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে।

কোনো শিশুকেই তার শিক্ষাজীবনের যে কোনো স্তরে তার পছন্দসই এবং গ্রহণযোগ্য বিষয় বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে দেওয়া চলবে না। সে যে স্কুলে ভর্তি হয়েছে সেই স্কুলের অপারগতা কিংবা কোনো এক সময় কথিত কোনো মন্তব্যের ভিত্তিতেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলবে না।

যদি প্রত্যেককেই শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে শিক্ষা প্রাপকদের এ বিষয়ে অবশ্যই সবিশেষ অবহিত করতে হবে। তাকে জানতে হবে সে কেন এবং কি জন্য প্রাত্যহিক এই কর্মসূচী অনুসরণ করে চলেছে। স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কসূত্রই বা কি। যে বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে ছেলে এবং মেয়েদেরকে শিক্ষাদান

চাকুরীর জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় অথবা যে চাকুরীর জন্য গঠিত বিষয় বা গৃহীত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোনোটাই কাজে লাগে না। অথবা যে ব্যবস্থা চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সময় অতিবাহিত করার সুযোগ দেয়, সে ব্যবস্থার অধীনে পাঠরত বা শিক্ষাগ্রহণরত ছাত্রছাত্রীরা যে স্কুল ত্যাগ করবে অথবা সার্থকতা অর্জনে ব্যর্থ হবে সে তো জানা কথা। এ সব ঘটনা এবং অনুক্রম থেকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যাবে যে, প্রত্যেককে শিক্ষা দেওয়ার আসা করা বৃথা।

কোনো ছেলের মনে যদি এই বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় যে, সে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট হতে পারবে আর যদি স্কুল ত্যাগ করে তাহলে গর্ত খোঁড়ার কাজ পাবে এবং সবসত্ত্বেও ভবিষ্যতে সে যদি গর্ত খোঁড়ার কাজই পায় তাহলে যারা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে তাদের প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করবেই। শিক্ষার্জন করলেই ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে এবং সামাজিক উন্নতি ও আর্থিক উন্নতি ঘটবে এই ধারণাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু শিক্ষা বিবেচনাবোধ জাগ্রত করে এবং বিবেচনাবোধ আপন গুণেই ভাল, এই ধারণাটি কিন্তু অসত্য নয়। এই প্রবন্ধে 'শিক্ষা' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেই অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পক্ষে তার উপকারী বলে বিবেচিত হবে। ছাত্রটি যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবলা করতে পরবে। কোনো শিক্ষাব্যবস্থা যখন কোনো ছাত্রকে কোন একটি বিষয়ে তৈরী করে দেওয়ার ভান করে তখন এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে এই ছাত্রটি নিজেকে প্রতারিত বলে বিবেচনা করে। ত্রুটি ওই ছাত্রটির নয়, ত্রুটি এই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার।

সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট লোকের শিক্ষা এবং সকলের শিক্ষা

১৯৬০-এর দশকে সাধারণভাবে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, বিভিন্ন ধরনের ছাত্রের অন্তর্ভুক্তির জন্য যাদের অনেকেই এসেছে অপরিচিত সাংস্কৃতিক আবর্ত থেকে, সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট লোকের জন্য

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বাতিল করতে হবে অথবা এমনভাবে এগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে কম ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রেরাও সেখানে ভর্তি হতে পারে। এই ছাত্রেরা এই প্রথমবারের মত অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সেটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে সম্ভাব্য সবচেয়ে উত্তম শিক্ষা দেওয়া হতো কিনা। এটা যদি শুধু উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ছেলেমেয়েদের 'প্রাধান্য' প্রতিষ্ঠার একটা ঐতিহ্যসম্মত মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় তাহলে এটা তাদের বা আমি কারও কোন কাজে আসবে বলে বিবেচনা করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অপরপক্ষে, এই সম্ভ্রান্ত স্কুলগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা যদি প্রচলিত যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় উত্তম বলে বিবেচিত হয়, তাহলে এই শিক্ষা সংজ্ঞা মোতাবেক প্রত্যেকেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। কেননা, বর্তমানে এই সুবিধা প্রত্যেককে না দেওয়ার পিছনে কোন কারণই থাকতে পারে না। বিপরিতপক্ষে এই সুযোগ প্রত্যেকের পাওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারণের অভাব নেই।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বহু দেশেই সম্ভ্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি চিরাচরিত সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং উড়ংসর্বস্বতার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সাধারণতঃ এগুলি ছাত্রদেরকে যতদূর সম্ভব সজ্ঞান-সচেতন করে তোলার ব্যাপারেই আগ্রহী। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বুদ্ধিজীবীসুলভ বৃত্তির কলাকৌশল রপ্ত করার জন্যই স্থাপিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা, প্রতিবেশ সম্পর্কে সজাগ করা এবং নতুন এক জগতের দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাসূচীকে উদারনৈতিক আখ্যায় ভূষিত করা হতো, এটা ছিল মুক্ত মানুষের উপযোগী শিক্ষাসূচী। সব মানুষকে যদি মুক্ত করতে হয় তাহলে সব মানুষকেই এই শিক্ষা দিতে হবে।

এই ধরনের সাধারণ নিরীক্ষার আলোকেও আমরা অবশ্য উদার-নৈতিক বলে পরিচিত যে, কোন শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা না করে

পারি না। এ থেকে অবশ্য একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। সেটি হচ্ছে, সম্ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্মূল করা উচিত হবে না বরং এর উদ্দেশ্য যাতে সকলের জন্য সমান শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধি হয়ে ওঠে সে ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আবার বলতে চাই যে, এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যেন এ কথা না ভাবেন যে, আমরা প্রাচীন বা নতুন রীতিতে উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করছি। পুরোন যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা নতুন দিনের নতুন আলোকে বিচার করতে হবে। নতুন দিনের কাজ হলো শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে প্রতিটি মানুষকে মুক্তমনা করে গড়ে তোলা যায়।

উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে কেন?

উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার মৃত্যুর কারণ এর বদনাম। নামটি হচ্ছে 'সম্ভ্রান্ত'। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেগুলি, ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণীর দুর্গবিশেষ। এই আলোকে বিচার করলে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য একচেটিয়া বলে জাহির করা হয়। এর অর্থ সুবিধাভোগী শ্রেণীর বাইরের লোকদের এখানে প্রবেশাধিকার নেই অথবা এই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে শিক্ষার্জনের সুযোগ নেই। যাঁরা উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীন কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এটিকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন। এককালে সুবিধাভোগী শ্রেণী অথবা শাসকবর্গের একচেটিয়া অধিকারে ছিল বলেই উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে নিন্দার চোখে দেখা ঠিক হবে না। যেহেতু এখন প্রতিটি ব্যক্তিই শাসকের আসনে আসীন এবং যেহেতু এখন প্রত্যেকেরই বিশ্রাম উপভোগের সুযোগ আছে, সে কারণে এখন প্রত্যেককেই উদারনৈতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৩. জাতীয় শক্তি এবং প্রাচুর্যের জন্য শিক্ষা

শিল্পসমৃদ্ধ জাতিসমূহ

"মানুষের পিছনে বিনিয়োগ"

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের প্রবণতাগুলিকে একটিমাত্র বাক্যে চিহ্নিত করা যায়—মানুষের পিছনে বিনিয়োগ। পূর্বে বিনিয়োগ বস্তুবিশেষের পিছনে করা হতো। এই বস্তু খুঁজে পেতে হতো, পরিশুদ্ধ করতে হতো, বহন করে নিয়ে যেতে হতো এবং বিক্রয় করতে হতো। যে জ্ঞানবিজ্ঞান, যা এতকাল জৈবিক ধরনের ছিল, অধুনা বাস্তবভিত্তিক ফলদায়ক হয়ে উঠেছে। উদাহরণতঃ পরমাণু সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের ব্যাপারটি উল্লেখ করা যায়। শিক্ষার্জনে নিযুক্তির ফলে শ্রম বাজারে তরুণদের উপস্থিতি হ্রাস পাবে এবং ফলতঃ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে আগেকার দিনে এ-রকম ভাবা হতো। বর্তমানে এই ধারণার অবসান ঘটেছে। এখন মনে করা হয় কোনো ব্যক্তি যত বেশী শিক্ষা পাবে অথবা সে যত বেশীদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাঁর পার্থিব উন্নতি ঘটবে তত বেশী। একইভাবে যে দেশে যত বেশী সংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকবে সে দেশ তত বেশী শক্তিশালী এবং ধনসম্পদ বলীয়ান হয়ে উঠবে বলে অধুনা মনে করা হয়। এ কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক উৎসাহের আধিক্য ঘটেছে।

পশ্চিমের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে প্রাচ্যের দেশগুলির পার্থক্য এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে শিল্পায়িত হয়ে উঠেছে এমন দেশগুলির পার্থক্য শুধুমাত্র গুণগত। প্রাচ্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলি বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রতি অধিকতর মনোযোগ অর্জন করেছে। উন্নতশীল দেশগুলির বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের তুলনামূলক দারিদ্র্য। এ ছাড়া সার্বজনীন শিক্ষার ঢেউ এখানে দেরীতে এসে

পৌঁছবার ফলেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এখনও শিক্ষা বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই দেশগুলির অনেকেই বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলগত বিপ্লবের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই দুই প্রকার বিপ্লবই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে, শেষাবধি সারা পৃথিবীব্যাপী নিশ্চিত ছড়িয়ে পড়বে।

অসংখ্য বিবেচক অথবা সজ্ঞান-সচেতন লোকের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। মানুষের পিছনে বিনিয়োগ বলতে যদি শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগ বোঝায় তাহলে এটাকে সারা বিশ্ব-বাসীরই সম্বর্ধনা জানান উচিত। কিন্তু এই বাক্যটিকে যখন জাতীয় শক্তির বস্তুবাদী নির্ভরস্থল এবং এটাকে জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্যের নিয়ামক বলে বিবেচনা করা হয় তখনই এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ বিষয়ে কোনো বিরোধের অবকাশ নেই যে, মানুষের পিছনে প্রজ্ঞা-সহকারে বিনিয়োগ করলে, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পিছনে দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞান চর্চা এবং আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে জানা যায় কোন বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পিছনে কি বিনিয়োগ করলে সমুচিত ফললাভ ঘটবে বা ঘটবে না তা স্থির করা খুবই দুরূহ। সৌভাগ্যক্রমে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যদি ফলপ্রসূ হয় তবু প্রশ্ন থাকছে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এই লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে, আর তা যদি হয়ও তাহলেই বা এই উদ্দেশ্য কি প্রকারে সাধিত হবে।

ওরটেগা ওয়াই গ্যাসে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন এইভাবে : আপনারা কি মনে করেন ডলার আছে বলেই বিজ্ঞানচর্চা ঘটবে? বিজ্ঞান-চর্চার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে একটি উদার সাংস্কৃতিক আবহ। বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য থেকেই বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া রাতারাতি বিজ্ঞানচর্চা করবে বলে মন করে এবং এরপর শুধু এ-ব্যাপারে টাকা-পয়সা ও মানুষ নিয়োগ করেই বাঞ্ছিত ফললাভ করে এই

বালসুলভ সিদ্ধান্তটি যাঁরা জাহির করেন তাঁরা ১৯১৭ সালের পূর্বে রাশিয়ায় দীর্ঘকাল যাবত বিজ্ঞানচর্চার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কোনো সংবাদই রাখেন না। বিশ্ববিচিত্র উদ্ঘাটনের নিয়মতান্ত্রিক চর্চার নাম বিজ্ঞান। এটাকে অতি সাম্প্রতিক 'প্রয়োজন' মেটাবার কাজে ব্যবহার করলে উপকারের তুলনায় অপকারের সম্ভাবনাই হবে বেশী।

'জ্ঞানশিল্প'

প্রতিটি শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন এবং সরবরাহ করা। আমরা 'ধর্মশিল্প' বা 'দর্শনশিল্প' বলি না। ১৯৬০-এর দশকে অধিকাংশ লোক শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ভাবে বিবেচনা করেন তাতে এগুলিকে 'জ্ঞানশিল্প' আখ্যায় আখ্যায়িত করাটা সঠিকই হয়েছে বলতে হবে। একটি দেশে দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সরবরাহের এটা একটা উপায় হতে পারে। 'জ্ঞানশিল্পে নিযুক্ত কর্মী' সংগঠনের উপর দেশটির উন্নতি-অবনতি নির্ভর করবে।

জ্ঞানশিল্প সংগঠন অত্যন্ত যত্নসহকারে করতে হবে। নতুবা এটা আত্মপ্রতারণামূলক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ১৯৬০-এর দশকে তাৎক্ষণিক ফললাভ ঘটতে পারে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিজ্ঞানের এই জাতীয় শাখায় টাকা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত মানুষ নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত লোকেরা এতে যোগ দেয়। বিরাট অঙ্কের সরকারী সাহায্য বরাদ্দ করায় সবচেয়ে যোগ্য তরুণ এবং তরুণীরা এই জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসেন। শিক্ষক স্থানীয়ভাবে পরিচিত। গবেষণামূলক কাজে নিয়োজিত কর্মীর [illegible]য় তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। তার কারণ গবেষণামূলক [illegible]জে নিয়োজিত কর্মীর পরিচয় তার গবেষণা পত্রের কল্যাণে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিনিয়োগ ২০০ গুণ বৃদ্ধি

পায়। এই বরাদ্দকৃত অর্থের বেশীর ভাগই কতকগুলি বাছাই করা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাপ্রদানের আগ্রহ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং এখানকার শিক্ষার মান নীচু হয়ে গেছে বলেও শোনা যেতে থাকে।

১৯৬৩ সালে ৩০০০ শিক্ষকের একটি দলকে জরিপ করে দেখা যায় যে, আমেরিকার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও সবশ্রেণীর শিক্ষকেরাই উপস্নাতকদের পিছনে এ পর্যন্ত তাঁরা যতটুকু সময় ব্যয় করেছেন তার চেয়েও কম সময় ব্যয় করতে আগ্রহী। ছোটো-বড় সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেই এই প্রবণতা রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি শিক্ষকই স্নাতকদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত হতে চান। বিশেষতঃ গবেষণাকর্মে।

১৯৬৪ সালে কার্নেগী ফাউণ্ডেশন শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রগতি শীর্ষক একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। এতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'মূল্যমানের সংকট'-এর বিষয় উল্লেখ করা হয়। এই সংকটের মূল কারণ হিসাবে এতে "গবেষণার জন্য অঢেল অর্থ বরাদ্দ, সুযোগ-সুবিধা, পদমর্যাদার সুলভ বৃদ্ধি এবং লোভনীয় প্রস্তাব" বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় 'প্রচুর আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে তরুণদের মনে 'সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো আনুগত্য' বজায় থাকবে বলে মনে হয় না। তার বিচারে 'ছাত্রেরা অধিক ব্যয়বরাদ্দ, অধিকতর বেতন এবং উচ্চপদ অনুসন্ধানের পথে বিঘ্নস্বরূপ।' 'জ্ঞানশিল্পকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেওয়ার' এটি একটি উপায় বটে।

বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন

কিছুসংখ্যক পূর্বাভাস দেখে মনে হয় আগামী পঁচিশ বছরে সাধারণ মানুষের তুলনায় বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অতীতের তুলনায় আগামীতে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা আরও বিশেষত্বমূলক এবং আয়াসসাধ্য হলেও এদের সংখ্যা

যে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারিগরি বিপ্লবের যুগেও বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার বেকার ছিলেন। অনেকে বলে থাকেন যে, উন্নতশীল দেশগুলিতে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন—কিন্তু, ১৯৬০-এর দশকেই গ্রীস, ভারত এবং মিসর তাদের যে ধরনের কুশলী মানুষের দরকার, ঠিক সেই ধরনের মনুষ্য শক্তি বিদেশে রপ্তানি করছে দেখা যায়।

কম্প্যুটারই আজকাল কম্প্যুটারের কার্যসূচী নির্ধারণ করতে পারে। কম্প্যুটার এখন শিল্পায়নের জন্ত প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নকারীর কাজ করতে সক্ষম। যাঁরা জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন তাঁরা বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাধিক্য না ঘটিয়ে গুণগত মান উৎকর্ষসাধনে মনোযোগী হলে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি যুগে 'বাজারজাত যোগ্য গুণাবলী'

জাতীয় শক্তি ও প্রাচুর্য বৃদ্ধির ব্যাপারে যারা উৎসাহী তাদের ধারণা শিল্পকারখানাগুলি চালু রাখা ও শ্রমিকদের অন্ন সংস্থানের জন্ত তাদেরকে উচ্চহারে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন আছে।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিক্ষার ব্যাপারে নতুন উৎসাহের মূলে রয়েছে একটি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের অনুবর্তীরা মনে করেন বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি প্রাধান্যের এই যুগে জাতি অথবা ব্যক্তিকে উন্নত করতে হলে আরও অধিক শিক্ষাসম্প্রসারণের ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এই শিক্ষা যত বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কারিগরি ধরনের হবে ততই সুফল পাওয়া যাবে। এটাই হলো টিকে থাকার উপায়।

বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি প্রাধান্যের যুগে কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন সমধিক সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। বর্তমানে আমরা শুধু শিল্পব্যবস্থা চালু রাখা ও জীবিকা অর্জনের জন্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা তা পর্যালোচনা করব। এই ধরনের শিক্ষা কি 'বাজারজাতযোগ্য নৈপুণ্য' সরবরাহ করতে সক্ষম?

বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং মেরামতকারী ছাড়া স্বয়ংচালিত শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হবে না। নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য এমনকি তাদের লেখাপড়া কিংবা অঙ্ককষা জানারও প্রয়োজন হবে না। ভবিষ্যতের শিল্পকারখানার সাধারণ শ্রমিকদের কাজ হবে অমুক লাল বাতিটি জ্বলছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা অথবা বংশীধ্বনীটি শোনা যায় কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা। স্পেনের অশিক্ষিত মেয়ে কর্মীরা পশ্চিম জার্মানীর যন্ত্রচালিত রুটির কারখানাগুলিতে তদারকীর কাজ করছে। তারা বাইসাইকেলে চেপে রুটি সেঁকা তন্দুরগুলির সম্মুখে ঘোরাফেরা করে। যখনই কোন সাবধানসূচক ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে তখনই তারা মেরামত-মিস্ত্রীকে খবর পৌঁছে দেয়। তারা যেহেতু জার্মান ভাষা জানে না সেইহেতু একটি বোতাম টিপেই তারা এই কাজটি সম্পন্ন করে।

শিল্পায়িত দেশগুলিতে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা

শিল্পায়নের দিক দিয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে সর্বচেয়ে বাস্তবানুগ শিক্ষা যেহেতু সবচেয়ে বেশী তত্ত্বনির্ভর, সেই হেতু ওই দেশগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যদি শুধু জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়, তাহলে শক্তি এবং সমৃদ্ধির দিক দিয়ে তারা অগ্রবর্তী থাকবে। অপরপক্ষে, যে বা যেসব দেশ শক্তি এবং সমৃদ্ধি অর্জনকে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেবে তাদের আশাভঙ্গ ঘটবে। তারা জ্ঞান-পরিচর্যার ক্ষেত্রেও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।[১] এটি সাধারণ নিয়মের একটি উদাহরণ। এই উদাহরণটিকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগাব এবং দেখাব যে, শিক্ষার মূল সুবিধাগুলি পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে। মন কোন আধার নয়; তথ্যপঞ্জী জ্ঞানচর্চার বিকল্প হতে পারে না। পঠিত বা আহরিত তথ্যসমূহ বিস্মৃত হওয়ার পর যা থাকে তাকেই বলে শিক্ষা। চিন্তাধারা, প্রয়োগ-পদ্ধতি এবং মানসিক অভ্যাসসমূহ অধীত শিক্ষার তেজস্ক্রিয় সঞ্চয়। শিল্পায়নের দিক দিয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে উদ্দেশ্যমূলক

শিক্ষাব্যবস্থা শক্তি ও সমৃদ্ধি আনবে এমন আশা করা বোকামি হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশ্রেণীর বিবাহ-ব্যবস্থার প্রচলন দ্বারা যেমন বিবাহবিচ্ছেদের হার হ্রাস করা যায় না এও তেমনি।

উন্নতিশীল দেশসমূহ

সম্পদ এবং জনসংখ্যা

শিল্পায়নের দিক দিয়ে অগ্রসর দেশগুলির যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষমতা নেই বলে যে দাবী করা হয় তা সর্বাংশে সত্য নয়। এর মানে হচ্ছে লোকেরা শিক্ষাকে তেমন মূল্য দেয় না। উন্নতিশীল দেশগুলির অধিকাংশই সত্যিকারভাবে দরিদ্র। এ সত্ত্বেও, এই দেশগুলির অধিকাংশই ১৯৬০-এর দশকে শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য আত্যন্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারকল্পে এই দেশগুলির অর্থব্যয়ের তুলনায় লোকসংখ্যা অধিক দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ছাত্রসংখ্যাকে দ্রুত ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ল্যাটিন আমেরিকার জনসংখ্যা প্রতিবছর শতকরা তিনভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ প্রতিবছর স্কুলগামী বয়সে পদার্পণ করছে। প্রতিটি ছাত্রের জন্য যদি বছরে ৩০ ডলার করে ব্যয় করা হয় তাহলে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিটি শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওই দেশসমূহের জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.৫ ভাগ ব্যয় করতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল সবচেয়ে সম্পদশালী বলে পরিগণিত। এই দেশের স্কুলগামী ছাত্রের শতকরা ৫০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদ্যাভ্যাস করছে। ১৯৫০ সালের হিসাব অনুযায়ী এক্ষেত্রে ব্রাজিলে শতকরা ৭ ভাগ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৮-বিদ্যালয়ের ছাত্র বয়সের ঊর্ধ্ব বয়স্ক নিরক্ষর বালক-বালিকার সংখ্যা ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল নাগাদ ৫০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এক কোটি ৫০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে।

প্রচলিত অনুমানসমূহ

চলতি সময়ে এই ধারণা প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, শিক্ষাই জাতীয় উন্নতি অর্জনের একমাত্র পথ এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের প্রচেষ্টাতে অর্থবিনিয়োগ করলেই শিল্পায়নের পথও আপনা-আপনি প্রশস্ত হয়ে যাবে। এইভাবে সমৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হবে। বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিদ্যার উপর প্রাধান্য আরোপ করলে এই ফললাভ আরও সহজতর হবে বলেই মনে করা হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমঝোতা বৃদ্ধি, বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশসাধন অথবা শিক্ষার্জনের মাধ্যমে মানুষকে উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্য এই শিক্ষাব্যবস্থার থাকে না। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনকেই বড় করে দেখা হয়। এই উদ্দেশ্যকে, এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিক্ষার সংজ্ঞা অনুসারে অমানবিক, মনুষ্য-বিরোধী অথবা মনুষ্য ব্যতিরেকী বলে অভিহিত করা হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণের বিরুদ্ধে আর একটা বাস্তবানুগ যুক্তি আছে: সেটা হচ্ছে—এই ধারনা কার্যকরী হবে না। এই ধারণা কার্যকরী হবে না তার কারণ এই সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সাংস্কৃতিক আবহের পটভূমিতে সেটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

শিক্ষাব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করা উচিত এই ধারণার মূলে কতকগুলি কার্যকরণগত ভুলবোঝাবুঝি আছে। এই প্রসঙ্গে জাতিসমূহের দৃশ্যমান চিত্রের প্রতি চোখ রাখলে আমরা খুব সম্ভব সি. অ্যারনও অ্যাণ্ডারসনের এই ধারণার সঙ্গে একমত হবো যে, "পোশাকী শিক্ষার পরিমাণের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির পরিসংখ্যানগত মিল খুবই অনুল্লেখ্য।"[২] অ্যাণ্ডারসন আরও বলতে চান যে, আয়ের মাত্রা অনুসারেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্রসংখ্যার দ্বারা আয়ের মাত্রা নিরূপিত হয় না। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার্জনের ব্যাপারটা কখনও কখনও যতটা উন্নয়নের কারণ

ততটাই আবার উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি প্রসঙ্গতঃ জার শাসিত রাশিয়ার উল্লেখ করে বলেছেন যে, বর্তমানকালের বেশীর-ভাগ অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় এই দেশটি উচ্চ আয়সম্পন্ন ছিল এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দিক দিয়েও এই দেশটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তথাপি ১৮৯৭ সালের আদমশুমারীতে প্রকাশ পায় যে, ওই দেশের ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ বছর পুরুষদের শতকরা ৪৪ ভাগ পড়তে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কোন একটি দেশের জনগণ কত সংখ্যক বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাটিয়েছেন তার সঙ্গে ওই দেশের মাথাপিছু গড়পড়তা মোট জাতীয় উৎপাদনের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। প্রশ্ন হ'লো স্কুলে ব্যয়িত বৎসরগুলি মোট জাতীয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে অথবা মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন স্কুলে অধিকসংখ্যক বৎসর শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এর শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই বিরাট একটি শিল্পশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে অথবা এটা ব্যতীতই? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালিত আছে সেটা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বহন করতে সক্ষম। উন্নয়নশীল দেশগুলি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সমৃদ্ধি অর্জনের আশায় এর শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ করবে? এই ব্যাপারে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমরা টি· ব্যালোগ ও পি· পি· স্ট্রিটন-এর সাবধান-বাণী স্মরণ করতে পারি। "আমেরিকায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহ, যা এযাবৎ-কাল ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের 'দরুন' অথবা 'কারণে' উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছান সম্ভব হয়েছে তা নির্দেশ করে না। এই তথ্যপঞ্জী থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এটাই আয় বৃদ্ধির কারণ। কিংবা এটাই 'যথেষ্ট' অথবা 'প্রয়োজনীয়' কিনা তা-ও এ থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই।"[২]

জাতীয় উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার ঝুঁকি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে

উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ বলে গণ্য করবে এবং মানুষকেও এটাই তার নির্ধারিত ভূমিকা বলে মেনে নিতে শিক্ষা দেবে। সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে চাকুরীর উপর। প্রকল্পটা থাকবে চাকুরীর সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ সাধন করা। শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমকেই চাকুরী প্রাপ্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে এবং যে ছাত্র এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সাফল্যজনকভাবে বেরিয়ে আসবে সে বিশেষ একটি কাজের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। যখন এই প্রকার শিক্ষালাভ করার পরও বিরাটসংখ্যক লোকের চাকুরীর সংস্থান করা সম্ভব হবে না তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবেই।

এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অমানবিক তো বটেই। অমানবিকতার কারণ এতে মানুষকে যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া, এটি অকার্যকরও বটে। কারণ এতে এমন বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয় যার ফলে উৎপাদনের ভালো-যন্ত্র পাওয়া যায় না। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কারণ বৈরী রাজনৈতিক প্রতিবেশ।

হারবিসন এবং ম্যায়ার্স নামীয় দু'জন অর্থনীতিবিদ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মোট জাতীয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে এদের মতামত নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল :

উদাহরণস্বরূপ উগাণ্ডার শিল্পনিপুণ কারিগর তৈরীর প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যায়। উনিশশো পঞ্চাশ-এর দশকে উগাণ্ডার বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রদানকারী স্কুলগুলিতে প্রতিটি ছাত্রের পিছনে উচ্চহারে টাকা-পয়সা খরচ করা হয়। ছাত্রের সংখ্যাও ছিল অনেক। এর ফলে কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশটির দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি-সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বৃত্তি-মূলক শিক্ষাপ্রদানকারী তেরটি স্কুল আট বছর সময়সীমার মধ্যে মাত্র পঁচিশ জন দক্ষ কারিগর তৈরী করতে সমর্থ হয়। অন্যান্য দেশে

আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, উগাণ্ডার ব্যাপারটি কোন ব্যতিক্রম নয়। বেশীরভাগ দেশেরই অবস্থাই এই রকম।

গ্রন্থকারদ্বয় উগাণ্ডার ব্যর্থতার জন্য শিক্ষাপ্রদানের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারের ত্রুটি, প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচন, কত বিভিন্ন ধরনের কারিগরের প্রয়োজন তা নির্ধারণে ব্যর্থতা ইত্যাদিকে দায়ী করেন। তাঁরা আরও মন্তব্য করেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় কারিগরি নৈপুণ্য শুধুমাত্র বাস্তব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করা সম্ভব। স্কুলে এই পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব হয়নি তার কারণ প্রয়োজনীয় আসবাব এবং যন্ত্রপাতি ছিল না, আর তেমন যোগ্য শিক্ষকও ছিল না।"[8] কোয়ান ও কোনেল এবং হ্যানসন বলেছেন, অনুন্নত দেশগুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কম ফলপ্রসূ এবং চাকুরীতে নিযুক্ত অবস্থায় শিক্ষা লাভের তুলনায় বেশী খরচসাপেক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছে।[5] সি. এ. অ্যাণ্ডারসন এজন্য আলাদা স্কুল অথবা স্কুলে 'বাস্তব' কর্মসূচী কোনটাই বাস্তবানুগ হবে না বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তার ধারণায় এ জন্য যে পরিমাণ অর্থ এবং পরিশ্রম ব্যয়িত হবে সে তুলনায় ফললাভ ঘটবে না।[6] এ. জে. ফরেস্টার-এর মতানুসারে শিশুদের মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবণতা পাঠ্যসূচীতে ব্যাপক রদবদল ঘটিয়ে রোধ করা যেতে পারে, এটা বিলাস চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পিছনে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণও নেই।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, গ্রীস, ভারত ও মিসর বর্তমান পর্যায়ে বিদেশে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যশক্তি রপ্তানি করছে। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেক দেশেই সমাজের উচ্চকোটির ধনবান লোকেরাই সর্বোচ্চ শিক্ষা পেয়ে থাকে। এই সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের রাজনৈতিক প্রভাবও সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিযোগিতায়

অবতীর্ণ হতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসমতাকে মেনে নিতে হবে।

অপরপক্ষে, যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকে কৃষিকাজ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় বলে বিবেচনা করা হয়, যেমন আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে, সেখানে শহরে লোকের আগমন বেশী ঘটে। এই শহরগুলি আগে থেকেই জনাকীর্ণ থাকে। অধিকসংখ্যক লোকসমাগমের ফলে এখানে বেকার সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। "তোমার বোন যদি স্কুলে যায় তাহলে তুমি পরেরবার খাদ্য হিসাবে পাবে তোমার ঝরণা কলমটি" এই অর্থবহ শীর্ষনাম সম্বলিত এক প্রবন্ধে রেঁনে দুমো বলেছেন, পশ্চিম নাইজিরিয়ার ৮০০,০০০ স্কুলত্যাগীর মধ্যে ৬৫০,০০০ জনের কোনো চাকুরী জোটেনি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্ট এফ. হোয়েসিজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হলেই যে কোনো নতুন দেশের উন্নয়নমূলক কার্যসূচী সাফল্য অর্জন করবে এ কথা বলা নিরর্থক। অধিকতর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা কি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে একথা বলারও কোনো মানে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সার্বজনীন শিক্ষা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত মনুষ্যশক্তির সাহায্যে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মূলে আছে এই দেশগুলির যথাযথ প্রতিবেশ। এই প্রতিবেশ ব্যতীত এই প্রকার সাফল্যলাভ করা সম্ভবপর ছিল না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে যে ফললাভ ঘটে উন্নয়নশীল নতুন দেশগুলিতে সে ফললাভ ঘটবে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফল বরং উল্টো অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দেশটির আয় হ্রাসের কারণ হতে পারে।[৯]

কোয়ান ও কোনেল এবং স্যানলনও এ বিষয়ে একমত। তাঁরা বলেন: "শিক্ষাই যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত করবে এমন কোনো

প্রমাণ নেই। তবে শিক্ষা যদি কেবল ব্যাপক উন্নয়নসূচীর অংশ হিসাবে গৃহীত হয় তাহলে আফ্রিকা-বিপ্লবে এর ভূমিকা ফলপ্রসূ হতে পারে। এই কর্মসূচীতে অবশ্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় অর্থ-নৈতিক উদ্যোগেরই সহযোগিতা থাকতে হবে।"[১৩]

সংক্ষেপে, যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করার ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহী পরিকল্পনাকারীকে শিক্ষা খাতে যাতে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার বিবেচনায় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে অধিকতর অর্থাগম সম্ভব।

মানুষকে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যতদিন না সরকার পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং যতদিন না সরকার তাদেরকে চাকুরীর জন্য প্রস্তুত করছে ততদিন সরকারের পক্ষে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক-দের চাকুরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি ছাত্রদের আশানুরূপ চাকুরী প্রদান না করতে পারার জন্য এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নেও শিক্ষা ব্যবস্থার রদ-বদল করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণসমূহের মূলানুসন্ধান

মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও সম্প্রসারণ ঘটবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটা না-ও প্রযোজ্য হতে পারে। অন্ততঃ ব্রাজিলে এমনটি ঘটেনি। এই দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যতম। তথাপি এই দেশের শিক্ষার মান জন-সংখ্যার তুলনায় নীচুই রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হওয়ার আগেও এর শিক্ষার মান এত নীচু ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ব্রাজিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট বলি-ষ্ঠতা অর্জন করেছে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও এই দেশে বেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফ্রাঙ্ক বোনিলা বলেছেন, "শুধু নতুন এক ধরনের রাজনৈতিক শাসনপ্রণালীই ব্রাজিলকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিজনিত

বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে পারে শিক্ষা। এই সমস্যা নিরসনে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে”

সমাজে উত্তরণের পথে মধ্যযুগীয় বাধা-বিপত্তির বিনাশ সাধারণের মনে ও প্রাণে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে নিঃসন্দেহে। ১৮৬৮ সালে মেইজী শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় জাপানে এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গতঃ জাপানের সঞ্চয়ী মনোবৃত্তির প্রবলতা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার—১৯০০ সাল থেকে এর হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ। শিক্ষার মানও ছিল খুব উন্নত, এমনকি পশ্চিমা শিক্ষার ক্ষেত্রেও। শিল্পায়নের পথে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই জাপানের পরিস্থিতি ছিল এইরূপ।

১৯৬০-এর দশকে যে সব ঔপনিবেশিক দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেগুলির তুলনায় ১৮৬৮ সালের জাপান শিক্ষা-দীক্ষা ও জাতীয় চেতনার দিক দিয়ে অনেক অনেক অগ্রসর ছিল। জাপানের ভাষা ছিল মাত্র একটি। সতেরো শতকের শেষভাগ থেকেই জাপানে ব্যাপকভাবে পুস্তকব্যবসা চালু হয়। তখনই কোনো কোনো গ্রন্থের দশ হাজার সংস্করণ প্রকাশ করা হতো। ১৮৬৮ সাল নাগাদ সাক্ষর লোকের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। মোট পুরুষ নাগরিকের শতকরা ৫০ থেকে ৪৫ ভাগ স্কুলে শিক্ষালাভ করে। ডোর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আজকালকার যে কোনো অনুন্নত দেশের তুলনায় ১৮৭০ সালের জাপানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। তিনি বলেন, “এমনকি তৎকালীন কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে এর তুলনা করা যেত। সেই ১৮৩৭ সালেও একটি ব্রিটিশ নির্বাচন কমিটি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশহরের চার থেকে পাঁচজন শিশুর মধ্যে মাত্র একজন স্কুলে শিক্ষালাভ করছে বলে জানতে পারেন। ১৮৭৭ সালে এক ফরাসী তার স্বদেশবাসীকে লজ্জায় অধিক কিছু দেওয়ার জন্যই বোধকরি লিখেছিলেন, “জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি

পর্যায়ে পৌঁছেছে যা দেখে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।"[১২] প্রসঙ্গতঃ এ কথাটি ভুললে চলবে না যে শুধু সাক্ষরতা অর্জনের জন্য যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন সেটিও কেবলমাত্র স্কুলের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। হ্যাভিগ হার্ট ও মোরেইয়ার মতানুসারে 'অশিক্ষার মূলে আছে গ্রামীন দারিদ্র্য এবং পশ্চাদমুখিতা। শুধু অর্থনৈতিক পরিবর্তন দ্বারাই এর প্রতিকার সম্ভব।"[১৩]

জাপানে পশ্চিমা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বহুকাল থেকেই ছিল। ১৭৫৬ সালে জাপানে একটি পশ্চিমা আদর্শে সংগঠিত রোগ নিরাময় শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৮১১ সালে জাপান সরকার প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধারের জন্য একটি অনুবাদ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৭৪৪ সালে স্থাপিত একটি প্রতিষ্ঠানের এটি উন্নত সংস্করণ। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই পরে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

জাপানের শিল্পসমৃদ্ধি বৃত্তিমূলক শিক্ষার কল্যাণে গড়ে ওঠেনি। শিল্পসংস্থাগুলিই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা করে। ১৮৯৩ সালে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বেই জাপান একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু হওয়ার আগে এই জাতীয় শিক্ষা শিল্পকারখানাগুলিতেই দেওয়া হতো এবং এগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটেনি। ১৮৭২ সালে সরকার যত শীঘ্র সম্ভব আটটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫৬টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৫৩,৭৬০টি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। চার বছর বয়স থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সূচনা করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। ত্রিশ বছর পর জাপানে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্ধেকসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চার বছর বয়স থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারটিও এই সময় নাগাদই কার্যকরী হয়।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে যে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে সেই বিশেষ পদ্ধতির অবদান ছিল

হয়ত বা। জাপান একটি দেশ যেখানে সাধারণ মানুষের কর্মনৈপুণ্যকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজে লাগান হয়েছে। হোসলিজ বলেছেন, '১৯৫৭ সাল নাগাদ, জাপানে শিল্পকারখানায় নিযুক্ত শতকরা ৫২% কর্মী এমন সব কারখানায় কাজে নিযুক্ত ছিল যেখানে মোট শ্রমিকের সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শিল্পকারখানার সর্বমোট উৎপাদনের হার ছিল এইরূপ: শতকরা ৫৯% উৎপাদিত হয় 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়' নামে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে (অর্থাৎ, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং এক কোটির কম মূলধন বিনিয়োগকারী কর্পোরেশন) এবং শতকরা ৪১% বিরাটাকার শিল্পকারখানাগুলিতে।[১৪] জাপানের বেশীভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানেই "উঁচু দরের মনুষ্যশক্তির প্রয়োজন" ছিল না।

এতদসত্ত্বেও জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রলেতারিয়েতের সমস্যা উৎকট রূপ ধারণা করেছে। জাপানী তরুণের বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই তাদের জীবিকা বাছাইয়ের সুযোগ দেবে। এ প্রসঙ্গে আবার বিশেষ কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে পারলে দ্রুত ফললাভ ঘটবে বলে তাদের বিশ্বাস। তরুণ রুশরাও এই একই বিশ্বাসের অনুবর্তী। তরুণ রুশদের মত তরুণ জাপানীরাও এ কারণে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য বারংবার প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সময় তারা অন্য যাবতীয় সুযোগ পরিহার করে। সরকারী অফিস, বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কতকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার দরুন জাপানে নতুন এক ধরনের মধ্যযুগীয় রাজ কায়েম হয়েছে। সবচেয়ে ভাল চাকুরীটি তিনিই পান যিনি সবচেয়ে ভালো বলে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা ও মাধ্যমিক কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ্য যোগসূত্র আছে। এরা উঠতি যুব সম্প্রদায়কে অসংখ্য বিকল্প সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অবশ্যম্ভাবী একটি জটিল পরিস্থিতি এড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

বিদেশী সংস্কৃতি

ঘানার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ নক্রুমা ১৯৫৭ সালে বলেন, "আমাদের সার্বিক শিক্ষা-প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি চেতনাসম্পন্ন লোক গড়ে তোলার কাজে নিয়োগ করা উচিত।" ১৯৬৪ সালে উনত্রিশটি আফ্রিকান জাতি ঘোষণা করে তারা, পনেরো বছরে আফ্রিকার বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা পনেরোগুণ বৃদ্ধি করবে। এই সম্মেলন সঠিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, অধিক সংখ্যায় তরুণদের বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত করাটাই হবে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

উন্নত দেশের কোনো বস্তিবাসী ছেলেও যদি স্কুলে বিরোধী সংস্কৃতির মুখোমুখি হয় তাহলে অনুন্নত দেশের ছেলেদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদান করতে যাওয়ার ফলাফল কি প্রকার হবে? আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বাতিল ছাত্রের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমান। তবে আফ্রিকায় এটা ঘটে প্রথম কি দ্বিতীয় গ্রেডেই।[৫] আমেরিকার ছাত্ররা যে কারণে স্কুল ত্যাগ করে আফ্রিকার ছেলেরাও সে কারণেই অনির্ধারিত সময়ে স্কুল ত্যাগ করে; একটি বিরোধী অথবা অচেনা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে যে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হবে তা শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে কি-না এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। তাকে তার জঙ্গল নিবাস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে এমন চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কিন্তু স্কুলে যাওয়া এবং বিদ্যাশিক্ষা করার কথাটা খুবই প্রকট। আফ্রিকার নেতৃবর্গকে প্রায়শঃই মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে বলা হয়। এর কারণ প্রাথমিক স্কুল থেকে ছয় বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই এত অধিকসংখ্যক ছাত্র পড়াশোনায় ইস্তফা দেয় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থব্যয় করা শেষাবধি নিষ্ফল হয়ে পড়ে। আফ্রিকার অনেকগুলি দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষালাভের উদগ্র কামনা এবং একই সংগে এজন্য যে পরিশ্রম স্বীকার করতে হয় তার প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

বিদেশী লিপি অনুবাদের যে দপ্তরটিকে ভিত্তি করে জাপানে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটি আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যাকে প্রতিবিম্বিত করছে। এই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ওই ধরনের বিদেশী লিপি অনুবাদের ব্যবস্থাসম্বলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাই সমধিক। এগুলিই বিরোধী সংস্কৃতিতে পরিচিত করে তোলার অন্যতম উপায়। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কারীদের বুলি ছিল : "পশ্চিমের বিজ্ঞান—পূবের নৈতিকতা"। প্রশ্ন হচ্ছে এই জাতীয় সংযোগ কি সম্ভব ?

এ ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য চরম কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি, গত একশত বছর ধরে জাপানে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা খুব আস্বাস্থ্যচক নয়। কেউই একথা বলবেন না যে, এই দুই সংস্কৃতিকে একই আধারে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে অথবা এদের সহাবস্থানে কোনো বিঘ্ন ঘটার অবকাশ নাই। যে অধ্যাপকটি কাজের সময় বিদেশী লিপি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তিনিই কর্মমুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্য আর এক আধারে জীবনযাপন করেন। এই বাসস্থানের ভিত্তিমূলই সম্পূর্ণ আলাদা। এই ধরনের একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের ফলে অস্থিরতার সংক্রমণ ঘটা বিচিত্র নয়। স্যার এরিক অ্যাসবে বলেন :

একজন আফ্রিকাবাসীর মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, একজন ইউরোপবাসীর পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। এই শিক্ষা আফ্রিকাবাসীকে তার পরিবার এবং গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে (যদিও সে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিয়মিত তার বাড়ীতে যাতায়াত করবে এবং যথাসময়ে পরিবারের দুর্বহ ভারও বহন করবে)। এই শিক্ষা তাকে পশ্চিমা পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করে—তা এটা তার পছন্দসই হোক বা না হোক। এই শিক্ষা তাকে দুটি আত্মিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করে এবং দুটি ভিন্ন নীতিবিজ্ঞানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশেও উৎসাহ দেয়। তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি চিন্তাধারার সঙ্গে

খাপ খাইয়ে চলতে হয়। .....সংশ্লিষ্ট সামাজিক দর্শনের প্রচলন না ঘটিয়ে কেউ টেলিভিশন এবং মোটরগাড়ীর প্রচলন করতে পারে না। মুদ্রা অর্থনীতির সঙ্গে কারিগরি বিদ্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এর ফলে সমাজে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে সময়ের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ব্যক্তি-মানুষকে তার পরিবার এবং গ্রাম ছাড়ার জন্য তৈরী হতে হয় এবং তাকে তার একত্ব জাহির করতে হয়। এই ধরনের প্রতিটি সিদ্ধান্তই ঐতিহ্যবাদী আফ্রিকান সমাজে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।[১৬]

ঘানায় তেইশটি বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে। এদের প্রত্যেকের ভাষা আলাদা। গোণ্ড কোষ, যা থেকে ঘানার উৎপত্তি, তার কৃত্রিম উদ্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির চাপ ও আপোষ মীমাংসার ফলে। এই গোষ্ঠী-প্রধান সংস্কৃতিতে এখন দু'টি সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এর একটি হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির সন্ধান এবং অপরটি বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি চেতনাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক শক্তি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তার প্রভাব খর্ব করাও আর একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তি যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাতে একটি জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা অথবা বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি চেতনাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি। যেহেতু দম বন্ধ হয়ে আসা অথবা স্বদেশজাত কোনো সংস্কৃতিরই কদর নাই সেইহেতু শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির বিশেষ কতকগুলি দিক, যথা—বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যা, বেছে নিয়ে বাকীগুলি বর্জন করলে সমৃদ্ধি অর্জন এবং স্বদেশী সংস্কৃতি অটুট রাখা সম্ভব হবে—এমন ধারণা ভুল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিল্প-নির্ভর সামাজিক কাঠামোতে বৃহৎ পরিবারের স্থান হবে না। কেননা, এই সমাজ ব্যক্তি-বিশেষের কাজের ভিত্তিতে তার জীবিকার ব্যবস্থা করে। অ্যান্থনি এইচ. এস. ক্রীক-গ্রীনি উত্তর নাইজিরিয়া সম্পর্কে লিখিত এক বিবরণীতে

বলেছেন, "আমি কতকগুলি সম্ভাবনাময় নেতাকে ১,০০০ ডলার বেতনের উচ্চপদের চাকুরী গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতে দেখেছি। কেননা, তাঁরা জানেন, তাঁদের এই পরিমাণ বেতন প্রাপ্তির খবর জানাজানি হয়ে গেলেই প্রতিবেশীরা তাঁদের এসে ছেঁকে ধরবে এবং ফলে তারা তাদের বেতনের খুব কম অংশই ভোগ করতে পারবেন। তাঁরা বরং পূর্বেকার ৫০০ ডলার বেতন পাওয়াকেই স্বাগত জানাবেন।"[১৭]

শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন

শিক্ষা, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা, উন্নয়নশীল দেশ-গুলির অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ এই আকর্ষণীয় ধারণার প্রচলন সত্ত্বেও এই দেশগুলির উন্নয়নের প্রতিবেশ সম্পর্কে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিরিখগুলি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলির শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নিরিখগুলোর সঙ্গে মিলে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত দেশগুলির তুলনায় বিশেষ ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। এই দেশগুলি আরও উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে এদের শিক্ষাব্যবস্থাও গড়ে উঠবে। এই ব্যবস্থাটিকে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ঠুনকো উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভবপর হবে না। অপরপক্ষে, এই দেশগুলি যদি তাদের জনগণকে সজ্ঞান, সচেতন ও স্বদেশী ও পশ্চিমা এই উভয় সংস্কৃতি অনুধাবনে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে এর ফলে যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্মেষ ঘটবে তা জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করবে না। শিক্ষা যে ভাল চাকুরী ও উচ্চপদ লাভের পূর্বশর্ত, এই ধারণা ত্যাগ করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। উন্নত এবং অনুন্নত এই উভয় প্রকার দেশেই এটা একটা বিকৃত এবং ভ্রান্তিমূলক ধারণা।[১৮]

৪. একনায়কতাবাদী ব্যতিক্রম

এই প্রবন্ধে শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, মানুষকে সংঘবদ্ধ এবং সক্রিয়ভাবে সজ্ঞান-সচেতন করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। এই সংজ্ঞায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্য-শক্তির বৃদ্ধি নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা এই উদ্দেশ্যে স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে হয়ত বা। এই প্রস্তাবের ভিত্তি শিক্ষার সঠিক তত্ত্বনির্ভর কোনো সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যবিধ সংজ্ঞার বাস্তব কার্যকারিতা অসম্ভাব্যতাই এর ভিত্তি। জাতীয় শক্তি অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করার অনেক অসুবিধা আছে। কোন দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে তথাকার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুধাবনের জটিল এবং অবোধ্য প্রক্রিয়াও শিক্ষাব্যবস্থাকে এহেন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার পিছনে একটি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক বিজ্ঞান স্থপতিবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও শিক্ষা-ব্যবস্থার যে নিজস্ব গতিশীলতা আছে তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। কোন শিক্ষাব্যবস্থারই চিন্তার প্রভাবমুক্ত মানুষ তৈরী করার ক্ষমতা নাই। আর যে মানুষ চিন্তা করতে পারে সে নিজের সংস্কৃতিকে যতই মূল্য দিক না কেন সে যে সমাজে বাস করে, তার সমালোচনা না করে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিক্রিয়া

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনেও স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে কিনা। এই সরকারগুলি এই প্রভাব থেকে তাদের সমাজকে মুক্ত রাখার জন্য কত ব্যাপক এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেন তার উপর এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে।

উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এই প্রবন্ধের অত্র সিদ্ধান্ত এই দেশগুলির অদ্যতন ইতিহাস নাকচ করে দিয়েছে। এই দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থা মনুষ্যশক্তি উৎপাদনের কাজেই নিয়োজিত রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ অ্যাণ্ডারসন বলেছেন :

মনুষ্যশক্তির ব্যবহার পরিকল্পনায়, বিশেষতঃ কেন্দ্রিক পরিচালিত অর্থনীতিতে, মানুষকে যন্ত্রের পরিবর্তন যোগ্য অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। এতে মানুষকে উৎপাদক সংগঠনের প্রয়োজনীয় ছাঁচের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। ঠগী পুঁজিপতির সত্যিকার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছে লৌহ-প্রভু। অর্থাৎ জবরদস্তী করে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পক। এই আদর্শবাদ শিক্ষা এবং ট্রেনিং গ্রহণে উৎসাহিত করলেও এরা বিশেষ গুণাবলীকে খুব সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করে এবং এর ফলে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারটি সামরিক নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পালন করা হয়। বিরাট মনুষ্যশক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে যে কোনো ত্রুটি বিরাট হতে বাধ্য। এর ফলে কিছুটা গোপনীয়ভাবে হলেও, কর্মসাধনের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিপীড়নমূলক চাপ প্রয়োগ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠবে।[১]

এই ব্যবস্থাপনায় ট্রেনিং প্রদান ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য থাকে। সেটি হচ্ছে মনুষ্যশক্তি যেন শিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যনিষ্ঠও হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই কর্তব্যানুরাগী করে তোলার পিছনে শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান প্রকাশ পায় শিক্ষার্থীকে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে।

নিজস্ব গণ্ডিতে এই ব্যবস্থা আশ্চর্যজনকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। কোটি কোটি নারী-পুরুষ এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুলে) শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে এবং হাজার হাজার নারী-পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হতে পেরেছে। এই বিপ্লব ব্যতীত এটা সম্ভব ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার উৎপাদনের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৫৬ সাল নাগাদ চীন

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক দেশ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে এই ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি হচ্ছে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও নির্বাচিত বিষয়সমূহ। ১৯৫৭ সালে চীনের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রী অব হায়ার এডুকেশন) প্রকাশ করেন যে, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অঙ্কবিদ্যাকে উনিশটি বিশেষ পর্যায়ে এবং পদার্থবিদ্যাকে ২০টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।[২]

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এক পর্যায়ে সোভিয়েট শ্রমিকদের জন্য সাধারণ শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করলেও এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য বরাদ্দ সময়ের ক্রমশঃ ঘাটতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা দুরূহ কেননা মনুষ্যশক্তি উৎপাদনে নিয়োজিত শিক্ষাব্যবস্থা মনুষ্যশক্তির চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বাধ্য। কিন্তু সরকার যতদিন চাকুরীর জন্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানিয়ে যাবেন ততদিন শিক্ষাব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নেই নিয়োজিত থাকবে। পলিটেকনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস, যে ব্যাপারে আমরা পরে আবার আলোচনা করব, এই ধারণাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মতাদর্শে দীক্ষিত করা

অ্যারিস্টটোল বলেছিলেন যে, নাগরিকরা যে সরকারের আওতায় বসবাস করে তাদেরকে সেই সরকার ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তাকে সে রকম করা হোক বা না হোক, সে যে সেরকম হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। পশ্চিমা দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট দেশে মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের ব্যাপারটিকে বাঁকা চোখে দেখা হলেও সব দেশেই এটা কোনো না কোনো রূপে বহাল আছে দেখা যায়। তফাৎটা হচ্ছে গুরুত্ব ও চাপ প্রয়োগের। নর্থওয়েষ্টার্ন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রান্সিস এল. কে. সু. বলেছেন:

কম্যুনিস্ট চীনে বিজ্ঞানীদের কত বেশী দলীয় নির্দেশ মেনে চলতে হয় তা বিবেচনা করার আগে আমরা অ-কম্যুনিস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পুঁজিপতিদের প্রভাব থেকে কতদূর মুক্তভাবে নিজেদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করতে পারি তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমরা যে সমাজের বাসিন্দা, সেখানে ব্যক্তি-মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করে।[৩]

প্রচেষ্টার আত্যন্তিকতা

ইতিহাস দাবী করে যে, ধ্বংসাত্মক ও বিরোধী বলে চিহ্নিত ভাবধারা থেকে জনগণকে অনরহিত রাখার ব্যাপারটি সার্বিক হতে হবে। আংশিক অথবা এলোমেলো উদ্যোগ কার্যকরী হবে না। জাপানে মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে স্কুলগামী তরুণদের সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল করে তোলা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল : বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এ ব্যাপারে একেবারে মুক্ত রাখা হয়েছিল। জাপানে যখন সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাদেরকে চিন্তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিক থেকে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

চীনে "শতপুষ্প" ফুটতে দাও এর যুগে এবং রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল তা পরে আদর্শগত সমন্বয়ের জন্য অধিকতর প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। চীনে শত পুষ্প-এর যে পুষ্পটি সরকারের মনোমত নয় সেটিকে নস্যাৎ করে এবং রাশিয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থায় মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের ব্যাপারটিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এই কাজটি সমাধা করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করার সময়সীমাও বর্ধিত করা হয়।

চীনে এই প্রচেষ্টা এখনও ফলবতী হয়েছে বলে মনে হয় না। মাও-সে-তুং ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক সচিব অাঁদ্রে মারলোর কাছে নাকি চীনা তরুণদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মাও-এর বক্তব্য অনুসারে চীনের

তরুণেরা নাকি সত্যিকার বিপ্লবী চেতনার পরিচয় দিচ্ছে না। তারা সরকারের শিক্ষা ও চাহিদার প্রতি তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। তারা কম্যুনিজমের প্রতি উৎসাহী নয় এবং রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যাপারেও উদাসীন। তারা বস্তুবিলাসী হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংগ্রামের প্রতিও তাদের কোনো উৎসাহ নাই।[৪]

কিভাবে শিক্ষিত এবং একনায়কতাবাদী উভয়ই হওয়া যায়

যে-কোনো ধরনের শিক্ষাই তার প্রাপককে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অসহিষ্ণু করে তুলতে বাধ্য। সে এই শিক্ষাব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ ভেবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে কিংবা যে নৈপুণ্য সে অর্জন করছে তা-ও তার অসহিষ্ণুতার কারণ হতে পারে। সে যে ব্যবস্থায় শিক্ষা পাচ্ছে, সেখানে যদি সরকার ও সংস্কৃতি তার সমালোচনাবোধ জাগ্রত করবে এমন যে-কোনো ভাবধারা বা আদর্শকে দাবিয়ে রাখে তাহলে ট্রেনিংপ্রাপ্তির সময় তার মধ্যে কোনো অসহিষ্ণুতাবোধ জাগ্রত হতে পারবে বলে মনে হয় না। এ কারণেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে দামের শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারিগরি বিদ্যার্জনে নিয়োজিত লোকদের সম্পর্কেও এর অতিরিক্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। কার্যকারণ না বুঝে ধরাবাঁধা দায়িত্ব পালনই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে মন্তব্যটি পুনরুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি সরকারের কোনো বিপর্যয় না ঘটিয়েই গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়েছে।[১]

চীন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত করতে গিয়ে কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছে। তার কারণ চীনের প্রধান বিজ্ঞানীরা অধিকাংশই পশ্চিমে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পিকিং-এর একাডেমী অব সাইন্স-এর পঁচিশজন সদস্যের মধ্যে তেরো জন যুক্তরাষ্ট্রে, সাতজন ইংলণ্ডে, তিনজন ফ্রান্সে এবং একজন জার্মানীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পার্টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জানিয়ে দেয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিক্ষা—এমনকি বৈজ্ঞানিক

গবেষণার ফলাফলও কম্যুনিজম-এর আদর্শভিত্তিক হতে হবে। বিজ্ঞানীরা যখন প্রতিবাদে জানান যে, বিজ্ঞানের ব্যাপারটি একান্তভাবে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে রাজনীতিকদের নাক গলান উচিত নয় তখন পার্টি উত্তরে জানায় যে, বিজ্ঞানের আলাদা কোনো মর্যাদা নাই এবং এই কথার প্রমাণস্বরূপ জনৈক চাষীকে অধ্যাপকসুলভ একটি পদে নিয়োগ করে। এই চাষীটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার সাধিত করেছিল। 'শত পুষ্প'-এর যুগে যে সমস্ত বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা বেমালুম গায়েব হয়ে যান অথবা তাঁদেরকে বেফাঁস উক্তি করার জন্য দোষ স্বীকার করে সংশোধিত হতে হয়। বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী তাঁদের ফলাফল প্রকাশ করার সময় পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাও-এর প্রতি ঋণ স্বীকার করে নিজেদেরকে রক্ষা করে থাকেন।'

বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক মনোভঙ্গি

বিশেষজ্ঞ হওয়ার একটা বিপদ আছে। সেটা হচ্ছে ওই বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য বিষয়ে অজ্ঞতার বোঝা বইতে হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের চাহিদা এই বিষয়ে বহুসংখ্যক শাখা স্থাপনে বাধ্য করে। বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন অভ্যাস করার সময় দৃশ্যতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে বদলীর প্রয়োজনীয়তা থাকে না বললেই চলে। বিজ্ঞানের স্বাধিকার, সোভিয়েট ইউনিয়নে যা অধুনা প্রায় স্বীকৃতিলাভ করেছে বলা যায়, তাতে বৈজ্ঞানিক ফলাফল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপরই নির্ভরশীল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এটা জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় একই নিয়ম নীতিকে প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করে না। সাধারণ বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন এবং বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন সবচেয়ে কঠিন কঠোর একনায়কতাবাদী সরকারের আওতাতেও সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

পরিবর্তনের উৎসসমূহ

শুধু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন অথবা কম্যুনিস্ট চীনে পরিবর্তন সূচিত হবে বলে আশা করা যায় না। এ কারণে, একবিংশ শতকে শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে সমর্থনের জন্য আমাদের অন্য দেশের দিকে নজর দিতে হবে।

রাজনীতি হচ্ছে স্থপতিবিদ্যামূলক বিজ্ঞান। এই দেশগুলি যদি একনায়কতাবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে তাহলে এদের শিক্ষাব্যবস্থাও আর একনায়কতাবাদীমূলক থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এই দেশগুলিতে একনায়কতাবাদী শাসনের অবসান ঘটাবে এমন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা চালু নেই। মনুষ্যশক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা বড় কঠিন ব্যাপার, এ কথা খুবই সত্যি। এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কম্প্যুটারের সাহায্যে চাকুরী এবং ট্রেনিং-এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। এ কথা সত্যি যে, বিশেষ বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জনের একটা খারাপ দিক আছে। এরপর আর সামনে এগোবার পথ থাকে না। কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত অথবা অপ্রমাণিক বিশেষত্ব অর্জনের ফলে বিষয়টিকে নতুন আলোকে বিচার করার মত বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না। এ কারণে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট চীন পূর্বে বিভক্তকৃত কতকগুলি শাখাকে একত্রীভূত করতে পারে। দ্রুত উন্নতির জন্য এগুলোকে বিভক্ত করা হয়েছিল। মনুষ্যশক্তি উৎপাদনের জন্য এটা হবে আরও বাস্তবানুগ পদ্ধতি। এর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যশক্তির উৎপাদন এই ধারণারও অবনয়ন ঘটবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট চীন যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তার পরিবারের আওতা থেকে বের করে সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষা-

লাভ না করা পর্যন্ত আটক করে রাখতে সমর্থ হয়, তাহলে একনায়কতা-বাদের বিরুদ্ধে যে নীরব সংগ্রাম চালু রয়েছে তার শেষ দুর্গটিরও পতন ঘটবে।

সত্যিকার দুর্বলতা

এর ফলে মানুষকে মনুষ্যশক্তিতে রূপান্তরিত করার পথে আর মাত্র একটি সত্যিকার দুর্বলতা থাকবে। সেটা হচ্ছে নীতি ও নীতিকে বাস্তবে পালনের দ্বন্দ্ব। মার্ক্স-এঙ্গেলস লেনিনের মত বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিশেষজ্ঞ উৎপাদনের বিরোধী। এই মতানুসারে কোনো একটি বিষয়ে নিপুণতা অর্জন অথবা সংকীর্ণ কোনো কার্যব্যবস্থার অধীনতা শ্রমিককে দাসে পরিণত করে। এর কারণ যখন কারিগরি পরিবর্তনের সূচনা ঘটে তখন তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। এবং তার পক্ষে আর একটি চাকুরী পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তার এই অসহায় অবস্থার জন্য সে চাকুরী পাক বা না পাক, শোষিত হতে থাকবে ও বঞ্চিত হতে থাকবে। শ্রমের বিভাগ কারণেই সর্বহারাদের দুর্বলতার একটি মূল কারণ।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস বলেছেন

জনগণের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় উৎপাদনের সামাজিক বিন্যাস সম্ভব নয়। যখন প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ কোনো একটি উৎপাদনের কোনো শাখার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, যখন তাকে এই জায়গায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যখন কেবল তার একটি ক্ষমতাকেই অন্যান্য ক্ষমতার মূল্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যখন তার কর্মক্ষেত্রের একটি শাখা অথবা শাখার কোনো একটি অংশে তাঁকে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে তখন তাঁর পক্ষে উৎপাদনের সামাজিক বিন্যাস করা সম্ভব হয়। এমনকি, আজকের দিনেও, শিল্পসংস্থাগুলি এই ধরনের মানুষকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারছে না।[৭]

১৯১৭ সালে লেনিন পার্টির কর্মসূচিতে কতকগুলি সংশোধনী কার্যকরী করেন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত সংশোধনীগুলি প্রণয়ন করেন

তার স্ত্রী—এন. কে. ক্রুপস্কায়া। ক্রুপস্কায়া শিক্ষা ব্যাপারে সোভিয়েট চিন্তাবিদ্‌দের অগ্রণী বলে পরিচিতা। এই সংশোধনীতে 'বৃত্তিমূলক' শব্দটির পরিবর্তে 'বহুশিল্পবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পার্টিকে বিশেষজ্ঞ নয় এমন লোকদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা। এই সময়কার রৈতাই বুলি ছিল 'বহুমুখীনতা।' রাশিয়ায় প্রণীত 'বহুশিল্পবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিতা' শীর্ষক একটি বিবরণীতে বহুশিল্পবিদ্যার উপযোগিতা বলতে শুধু শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং রুচি বিজ্ঞানকে নির্দেশ করা হয়েছে। এতে এই ট্রেনিং-এর অর্থনৈতিক উপযোগিতা, সে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি যার উপরই বর্তাক, সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করা হয়নি।

এই মতাদর্শে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, একটি ভয়ানক স্ববিরোধিতা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। শিল্পকারখানায় শ্রমবিভাগকরণ অপরিহার্য। কম্যুনিস্ট দেশগুলির লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পসমৃদ্ধি অর্জন। অতএব. রাষ্ট্রের প্রয়োজনএর অন্যতম একটি উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে—উদ্দেশ্যটা হচ্ছে: মানব জাতিকে শ্রমবিভাগীকরণজনিত দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া।

এই মতাদর্শটিকে অবশ্য কখনই বাতিল বলে গণ্য করা হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায়শঃই এই মতাদর্শটির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এটাই সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার মূল নিয়ামক বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যান্য ঘোষণা যে রকম নিস্পৃহতার সঙ্গে গৃহীত হয় এই ঘোষণাটিও সেইভাবেই গৃহীত হয়। শিল্পায়নের ব্যাপারটি যতদিন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে ততদিন মত ও কাজের মধ্যে এই বিরোধ অব্যাহত থাকবেই। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এবং এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কোনো বিশেষ বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জনের প্রয়োজন দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবেই।

প্রশ্ন হচ্ছে অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে কম্যুনিজমের বিঘোষিত আদর্শকে কিভাবে খাপ খাওয়ান যায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আওতায়

মনুষ্যশক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনাও স্থান পায়। কম্যুনিজমের বিঘোষিত আদর্শে 'নতুন মানুষকে' কাজে উৎসাহী, কর্মক্ষম, যে-কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করাতে সক্ষম এবং সবার উপরে, কাজের ধারা অনুধাবনে সক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়। নতুন মানুষ তৈরী করার পথে মনুষ্যশক্তির উৎপাদনের ব্যাপারটা ঘটনাচক্রের ফলাফল মাত্র।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পসমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মত ও পথের এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৩১ সাল নাগাদ মতের সঙ্গে পথের পার্থক্য এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি এই ব্যবস্থা নিরোধের প্রস্তাব দেয়। সেন্ট্রাল কমিটি বলে ঃ

স্কুলগুলির মৌল ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এখানে যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরিপূর্ণ শিক্ষিত লোক গড়ে তোলার ব্যাপারেও স্কুলগুলি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। জ্ঞানের মূল বিষয়গুলি (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অঙ্ক, ভাষাবিদ্যা এবং ভৌগোলিক বিদ্যা ইত্যাদি) আয়ত্ত করিয়ে তাদেরকে উচ্চতর কারিগরি ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে গড়ে তুলতেও এই স্কুলগুলি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই কারণে বহুশিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করার বিষয়টি বহুক্ষেত্রে পোশাকী শিক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে ও সমাজবাদের প্রসারে সাহায্যক্ষম বহুমাত্রিক গুণ বিশিষ্ট শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে।

পার্টির তরফ থেকে স্কুলগুলির প্রতি একটি নির্দেশ জারি করে বলা হয় যে, "ছাত্রদের দ্বারা কৃত সর্বপ্রকার সমাজ হিতৈষীমূলক শ্রম এই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে নিয়োগ" করাতে হবে।[৮] এ প্রসঙ্গে ডি. উইট তাঁর সারমর্মে বলেছেন, "১৯৫২ সাল নাগাদ তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রদানের বিরুদ্ধে সর্বত্রই ক্ষোভের সঞ্চার হতে দেখা যায়।"[৯]

মত ও পথের এই বিরোধ, বহুশিল্পবিদ্যার আদর্শ ও তার বাস্তবায়নের মধ্যেকার পার্থক্য, ১৯৫৮ সাল নাগাদ অব্যাহত থাকে।

এমনকি এর পরও এর নিবৃত্তি ঘটেনি। ১৯৫৮ সালে উৎপাদন ট্রেনিং ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সমন্বিতকরণের জটিলতার বিষয়টি অ্যাকাডেমী অফ পেডাগগিক্যাল সায়েন্স-এর সদস্য এন. ভারসিলিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বলেন:

প্রথমতঃ, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে আমরা শ্রমিকদের ট্রেনিং দেওয়ার সমস্যাটির সমাধান করতে পারি না। কিন্তু এই দুটির পরস্পরের মধ্যে সংগতিবিধান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের নিজস্ব বৃত্তিমূলক শিক্ষা নির্বাচন ও তার যোগ্যতা, প্রবণতা ও উৎসাহের মধ্যেকার বিরোধটি স্বতঃই দেখা দিতে পারে। লেনিনগ্রাডের জেলেজিনা স্ট্রীটে বসবাসকারী ছেলেমেয়েরা পাবলিক স্কুল ৪৪-এ শিক্ষালাভ করতে বাধ্য। এর ফলে এখানকার প্রতিটি ছাত্রকেই দড়ি তৈরার কারখানায় কাজ শিখতে হবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে বাসস্থানই একটি ছাত্রের ভাগ্য এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নির্বাচন করে দেয়। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ, দড়ির কারখানায় সকলের চাকুরী সংস্থান হওয়া সম্ভব নয়। এই স্কুলের ছাত্রেরা যে বৃত্তিমূলক শিক্ষাটি পেয়েছে তা আবার ব্যবহার করাও যাবে না। তার কারণ সারা দেশে দড়ি তৈরীর কারখানার সংখ্যা এত বেশী নেই। এক বছর আগে বাল্টিক মেশিন ওয়ার্কস-এ ধাতু তৈরী এবং 'মিলিং মেশিন' চালকের প্রয়োজন ঘটেছিল। চলতি বছরে এদের 'ওয়েল্ডার' এবং 'অ্যাসেম্বলী' শ্রমিকের প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি কি হওয়া উচিত? বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানোর ফলে সাধারণ শিক্ষা ইতিমধ্যেই অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদন ট্রেনিং এর সমন্বিতকরণের ব্যাপারটি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।...আসল কথা হচ্ছে, যে কাজটি তিন থেকে ছমাস কার্যে নিযুক্ত থেকেই শিক্ষা করা যায় সে জন্য কোন ছাত্রই বা দু'টি বছর শুধু শিক্ষার্জনে ব্যয়িত করতে রাজী হবে?[10]

শিক্ষা কোন্ ধরনের বস্তু সরবরাহ করতে পারে সে সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যে উক্তি করা হয়েছে ভারসিলিনের বক্তব্য তার সমর্থন

গেলে। উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার অনুপযোগিতা, এবং ট্রেনিং প্রদান ও চাকুরী সংস্থানের অসুবিধার কথাও এতে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর যুক্তি অবশ্য শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। তিনি যে বৎসর এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন সেই একই বৎসরে 'বহুশিল্পবিদ্যা' শিক্ষা দেওয়ার নামে ওই শিক্ষার মূলনীতিগুলিকে লঙ্ঘন করে সোভিয়েট ইউনিয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান শুরু করা হয়।[১১]

এটা যেহেতু খুব সম্ভবতঃ শ্রমিক সংখ্যার ঘাটতি পূরণের জন্য করা হয়েছিল এবং যে নেতার নেতৃত্বাধীনে এর সূচনা হয় তিনি যেহেতু আর ক্ষমতায় নেই সেই হেতু এই নীতি পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পটভূমিতে কার্যকরী করা হবে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বহুশিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য যে এর বিঘোষিত সংস্কার সম্পূর্ণ বিপরীত, ক্রুশ্চেভ সে বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ রাখেননি। তিনি বলেন, সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা যাতে উৎপাদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হয়। "এর ফলে যে শুধু স্নাতকেরা উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে তা নয়," "তাদেরকে বাস্তবানুগ কাযে' নিয়োগ করাও" সম্ভব হবে। "এর ফলে তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় সরাসরি নিয়োগ করা সম্ভবপর হবে।"[১২]

এই কর্মসূচীর অনেকাংশই বর্তমানে বর্জন করা হয়েছে। ১৯৬৪ সালে সেকেণ্ডারী শিক্ষাব্যবস্থার এগারতম বৎসরটিকে 'উৎপাদনের জন্য ট্রেনিং' দেওয়ার কাজে ব্যবহার করার পদ্ধতিটি বাতিল করা হয়। এতদসংক্রান্ত এক নির্দেশনামায় বলা হয় যে, ছাত্রদেরকে "শিক্ষা গ্রহণের সময় সম্পর্কহীন যে কোনো কাজ করান থেকে বিরত রাখতে হবে।" উৎপাদনের জন্য ট্রেনিং প্রদানের দশ বৎসর সময়-সূচীতে ব্যাপক হ্রাস করা হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো তিরস্কার করা হয়নি। এই ধরনের ট্রেনিং এবং বহু-শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যে পার্থক্য রয়েছে তা নির্ধারণেরও কোনো চেষ্টা করা হয়নি। আমেরিকান সূত্র থেকে

জানা গেছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন কামনা করেন। কেননা, এর ফলে ছাত্রেরা সংকীর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছে এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আরও একটা কারণ, এর ফলে ছেলেরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়, সাধারণ শিক্ষাপ্রদানই স্কুলগুলির প্রধান কর্তব্যকর্ম।[২৩]

ক্রুশ্চেভের উত্তরাধিকারীরা যদি তার ঘোষিত শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য একটা কারণ খুঁজতে চান তাহলে সেটা তারা মার্ক্সের পবিত্র লিখিত বাণীতেই তার সন্ধান পাবেন। তাঁরা এটা খুঁজে পাবেন কি না সেটা সংকীর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং মতাদর্শে দীক্ষিতকরণের ব্যাপারটিকে তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব দেবেন কি-না তার উপর নির্ভর করছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে কম্যুনিষ্ট পার্টি পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের কর্তৃত্ব বহাল রেখেছে, চীনেও প্রায় পঁচিশ বছর যাবত পার্টিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র সাম্প্রতিককালেই সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের কোনো নিকট-সম্পর্ক নেই এমন শিক্ষা প্রদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই শিক্ষা দেওয়া হবে "সংস্কৃতির জন্য স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে।" বেতার এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কার্যসূচীতেও এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

আমরা যদি অনুমান করে নিই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট চীন কেবল বৈজ্ঞানিক কারিগরি এবং শিল্প সমৃদ্ধিমূলক ব্যাপারে শিক্ষাদানে আগ্রহশীল তাহলে আমরা এই ধারণাও করতে পারি যে, এই বিষয়গুলিতে সাফল্যলাভের পূর্বশর্ত হিসাবে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও উদার করবেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশী ভাষা অনুবাদের বৃহত্তম সংস্থা রয়েছে। কিন্তু চীনে, যে দেশের সঙ্গে পূর্বে শুধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় ছিল, বর্তমানে একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞান এমন একটি বিষয়, যে বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করতে হলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্যাদি আদান-প্রদান করা একান্তভাবে অপরিহার্য। এটি সাধারণ নিয়মবহির্ভূত বিষয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ। বিজ্ঞানের জগৎ, ভৌগোলিক বিচারে, একটিই। এই জগত এখন বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও একটিতেই পর্যবসিত হতে চলেছে।

এই ব্যাপারটি যতই দানা বেঁধে উঠছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন বিশেষজ্ঞদের কাছে ততই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেননা, এর ফলে বিশেষজ্ঞের পক্ষে তার সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতের কোনো ব্যবস্থাই থাকছে না। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রনালের ফলে এবং প্রত্যেককে শ্রমমূলক কাজে নিয়োগ করার অপ্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পরে চীনে এই ব্যবস্থা গৃহীত হবে। বিজ্ঞান জগতের একতা, জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত মানুষদের একতা এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে শ্রমের নতুন ভূমিকা থেকে একবিংশ শতাব্দীতে এই দেশগুলিতেও যে শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছে।

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্যসমূহ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য

আমরা অনুমান করে নিয়েছি যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্ট চীন শুধু বিজ্ঞানিক, কারিগরি এবং শিল্পগত সাফল্যেরই মুখাপেক্ষী; এটাকেই তারা জাতীয় শক্তি সমৃদ্ধি অর্জনের পথ বলে বিবেচনা করে। এই একই ব্যাপারে অন্যান্য জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের কোনো অমিল নাই। পার্থক্য মাত্র একটিই এবং এই পার্থক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্থক্যটি হচ্ছে কার্যপ্রণালীর। কার্যপ্রণালীর একটি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত রাখা। এই লক্ষ্যের যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে কার্যপ্রণালী, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত কার্যপ্রণালীরও পরিবর্তন ঘটবে। প্রশ্নটা হচ্ছে: জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খার পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে কি-না। আমরা এখন এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই আত্মনিয়োগ করব।

৫. জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়

আজকের দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একটি রেডিও অথবা টেলিভিশনের সম্মুখে উপস্থিত জনমণ্ডলী বলে গণ্য করা যায়। পৃথিবীর জনমানুষ বর্তমানে একই সময় একই জিনিস দেখতে ও শুনতে পারে। রেডিও-ওয়েভ ও শব্দ তরঙ্গের মধ্যেকার পার্থক্যের দরুণ একটি বক্তৃতা কোনো কক্ষের পিছনে শ্রুত হওয়ার আগেই সারা বিশ্বে পরিক্রমণ করতে পারে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি মানব সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক। ভ্রমণ এবং পরিণতি সম্পর্কে একাত্মতাবোধ অথবা ভাগ্যলিপির নির্দেশ সম্পর্কে একাত্মবোধ মানুষকে পরস্পরের সন্নিকটবর্তী করে তুলেছে।

পশ্চিমা বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে বিশ্বসভ্যতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা টিকে থাকলে এই সভ্যতা হয়ত দেখেই যেতে পারব। এই সভ্যতা তত আকর্ষণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও জীবন-যাপনের রীতিনীতির সামঞ্জস্যের জন্য এটি আকর্ষণীয় বলে প্রতিভাত হবে নিঃসন্দেহে।

হার্ভে হুইলারের ভাষ্য অনুযায়ী : "অসচেতনভাবে বিশ্বজনীন একটি শিল্প পৃথিবীর সূচনা ঘটিয়ে মানুষ তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে সচেতনভাবে গড়ে তোলা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন করে তুলেছে। মানুষ সব জায়গায়ই সমান...বিজ্ঞান, কারিগরি কলাকৌশল, নগরীকরণ, শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন, যোগাযোগের মাধ্যম এবং বিশ্বজনীন সহযোগিতা তাকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন সে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখবেই।"

জাতীয় স্বার্থে নিয়োজিত শিক্ষাব্যবস্থা

আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কি কারণে এমনটি

ঘটতে পারে আমরা তা-ও উল্লেখ করেছি। এই কারণগুলির প্রত্যেক-টিই 'জাতীয় স্বার্থের' উপর নির্ভরশীল। এ থেকে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সব রাষ্ট্রই যেন ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে নস্যাৎ করার জন্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়োজিত করেছে।

যে সময়ে পৃথিবী কারিগরি জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে একতার পথে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই একই সময়ে ঔপনিবেশিক পরবর্তী জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের কাজে নিয়োজিত করবে। কিন্তু জীবনের সত্য অন্য দিগন্তের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে।

এই ধারণার মহৎ তাৎপর্য

জাতীয় স্বার্থের জন্য শিক্ষাকে ব্যবহারের ধারণাটি কত নতুন তা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। নেপোলিয়ন বা তার সমসাময়িক প্রুশি-য়দের সংস্কারকদের আগে ইউরোপে শিক্ষাব্যবস্থা তেমন বিস্তারলাভ করেনি। প্রায় একই সময়ে এরা শিক্ষাকে জাতীয় উদ্দেশ্য হাসিলে কাজে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন। এদের ধারা ছিল বিভিন্ন: নেপো-লিয়ন অনুগত প্রজামণ্ডলী এবং কার্যক্ষম আমলাদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন। এর বাইরে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি কঠিন নিগড়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন আজও তা বহাল আছে। প্রুশিয়ানরা নিজেদনপক্ষে কিছুসংখ্যক লোকের সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে স্ফুরণের সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা জ্ঞানের বিস্তারকেই রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক বলে মূল্য দিয়েছিলেন।

প্রাচীন সভ্যতার যুগে রাষ্ট্র এবং শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। প্লেটোর রিপাবলিক এবং অ্যারিস্টোটলের পলিটি-কস্ই এর জাজ্বল্য প্রমাণ। এর পরে এ নিয়ে আর কোনো বিতর্ক হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। এই বিতর্কের পুনরায় সূচনা ঘটেছে ২০০০ বছর পরে। জনলকের শিক্ষাবিষয়ক রচনাবলীতে এর কোনো উল্লেখ নেই। এডমাণ্ড বার্কের প্রকাশিত রচনাবলীতেও এ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করা হয় নাই।

শিক্ষা এবং পৃথিবীর যাজকসম্প্রদায়

খ্রীস্টান ধর্মের আধিপত্যের সময় শিক্ষার ব্যাপারটি গির্জার আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। শুরুতে গির্জা শুধু আত্মার রোগমুক্তির কাজেই নিয়োজিত ছিল। আত্মার অবশ্য কোনো জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা চরম লক্ষ্য নাই। এক ভাষা এবং এক ধর্মের দ্বারা একতাবদ্ধ হয়ে গির্জা, এর নিজস্ব আলোকে, আত্মার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। জাতীয় শক্তি অথবা সমৃদ্ধি নয়, অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গির্জা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

বুদ্ধিজীবীদের জগতের কোনো জাতীয় সীমানা ছিল না। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কত বিভিন্ন 'রাষ্ট্রের' ছাত্র যে জ্ঞানলাভ করতে আসত তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বেশ কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতার দিক দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সমকক্ষ অথবা তাদের চেয়েও বেশী শক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে কতকগুলি আবার গির্জার শাসক হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করে। ১৩৩১ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় বিভাগ পোপ জন দ্বাদশের একটি ধর্মীয় বিধানের নিন্দাজ্ঞাপন করে।

কেন্দ্রীভূত করার সম্ভাবনাসমূহ

সে সব দিন এখন বহুদূরে বলে প্রতীয়মান হয়। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত প্রতিটি দেশেই অধুনা শিক্ষাকে জাতীয় দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও এটা সরকারী দায়িত্ব বলে স্বীকৃত। প্রশ্ন হচ্ছে, দায়িত্বটা কোন্ সরকারের ?

'জাতীয় স্বার্থে'র প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সব দেশ তাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত করেছে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রাণালীতে যতই ভুল থাকুক না কেন, সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব থেকেই প্রতিটি সরকারের শিক্ষাব্যবস্থা যে স্ফুতিলাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। শুধু নৈশ পাহারাদারের দায়িত্ব পালনকারী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল ব্যক্তিরাই অন্য মত পোষণ করতে পারেন।

পোপ পাইউস একাদশ তাঁর রিপ্রাইজেনট্যাষ্ট ইন টেরা (১৯২৯) তে বলেছেন : "রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের নিকট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালন করার দাবী করতে পারে। এ ছাড়াও রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে সকলের কল্যাণের জন্য কিছু পরিমাণ বুদ্ধিজীবীসুলভ কার্য, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনা-বহতাও দাবী করতে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে।"

জাতীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূতকরণের বিভিন্ন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসকবর্গের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। দানশীল ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং ছাত্রবর্গের পিতামাতার পক্ষেও এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেই এই উদ্যোগের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞানবিষয়ক ডক্টরেট প্রার্থীদের প্রত্যেকের এবং যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গবেষণার চার ভাগের তিন ভাগের ব্যয়ভার বহন করছিলেন। নাগরিকদের স্বার্থ যেহেতু সরকারী অর্থসামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল সেই হেতু কেন্দ্রীয় ব্যয়ের প্রেক্ষিতে স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি সাধিত হতে পারে না।

বর্তমানকালের জনগণের চেতনাও এই পথেরই দিশারী। যে সময় কোন একটি গ্রামে জন্মগ্রহণকারী ছেলে গ্রামেই তার জীবন কাটাত তখন সেই গ্রামই তার শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব পালনের অধিকার রেখে এই যুক্তিটি দেখান চলত। ওই গ্রামটিই তার শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করবে এটাও যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু এখন সেই গ্রামের ছেলেটি যেহেতু সারা দেশেই ঘুরে বেড়ায় সেই হেতু সে কি ধরনের লোক সকলেরই তা জানার অধিকার আছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সে কিভাবে তার নাগরিক দায়-দায়িত্ব পালন করে তার প্রতিক্রিয়া দেশের সমগ্র জনগণের উপর বর্তায়। যেখানেই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের অধিকার

জন্মায় সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় ভিত্তিতে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে।

যে সব দেশে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়—কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে সে সুযোগ দেওয়া হয় না সে সব দেশে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর এক ধরনের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলি মূলতঃ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে। সরকারী অর্থ-ভাণ্ডারের উপর চাপ হ্রাস করাই এর প্রধান কারণ।[১]

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় দায়িত্বের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। এর ফলে যে জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে ১৯৬২ সালে আফ্রিকার অনুষ্ঠিত উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্মেলনেই তা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। এতে একত্রিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যোগ দেন। এই রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই নতুন। এই প্রতিনিধিদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের জন্যই কাজ করতে বাধ্য বলে মন্তব্য করেন। তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি "আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একতাসাধনের নিশ্চয়তা বিধান করবে" এবং একই সঙ্গে "বিশ্ব-সভ্যতার মূল ধারাগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য" প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[২]

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বিপুল সংখ্যক মানুষের যোগদান এবং ইউরোপের অবধারিত রাজনৈতিক একতা সাধন একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সারদিনিয়ার মোট লোকসংখ্যা পনেরো লক্ষ। প্রতি বছর সারদিনিয়ার ৪০,০০০ লোক দেশত্যাগ করে। এদের বেশীরভাগই সাধারণ বাজারভুক্ত কোনো না কোনো দেশে পাড়ি জমায়। এর ফলে সারদিনিয়াবাসীদেরকে যে কোন জায়গায় বাসের

উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অন্ততঃ ইউরোপের যে-কোনো জায়গার উপযোগী তো বটেই।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সমগ্র ইউরোপের জন্য একটি সাধারণ ডিগ্রি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হতে থাকে। এর ফলে কালক্রমে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় চরিত্র উন্নতরূপ ধারণ করবে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব দেশসমূহ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতেও এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং এই দেশগুলিতে এর প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সারা বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তার থেকে ভিন্ন কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার দায়-দায়িত্ব অঙ্গরাজ্যগুলিকে এককভাবে বহন করতে হয়। এখানকার স্কুল-গুলিতে স্থানীয় ইতিহাস ও সরকার ব্যবস্থার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা থেকে এই ব্যবস্থার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে। উদাহরণতঃ বলা যায়, ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বিধান অনুসারে ছাত্রদেরকে অগ্নিনির্বাসন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হলেও এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৫ সাল নাগাদ এ ব্যাপারে মোট ব্যয়ভারের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ বহন করলেও এ কথা কেউই বলবেন না যে, অঙ্গরাজ্যগুলি ছাত্র-দেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিক যেন তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। এটা এমন একটি বিষয় যা বিনা প্রমাণেই স্বীকার করে নেওয়া চলে।

মানব সমাজে শিক্ষা

যে শিক্ষাব্যবস্থা চলতি রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করে এবং তরুণ শিক্ষার্থীকেও এই ধারার অপরিবর্তনশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদান করে সেই শিক্ষাব্যবস্থা চলতি কারিগরি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে গড়ে তোলা শিক্ষাব্যবস্থার মতই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হবে এমন একটি গৌণ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়া যায়।

তরুণ শিক্ষার্থীকে কি অন্যান্য দেশ এবং দেশবাসী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করলে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে জ্ঞানদান করলে কি লাভজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে?

এই প্রশ্নের সমাধান বোধকরি এই উত্তরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার চেয়ে কোনো অংশে সুফলদায়ক নয়। মালয়বাসী কিংবা প্যাটাগোনবাসীদের সম্পর্কে অঢেল তথ্য জ্ঞাত হওয়া যে কথা অন্য যে কোনো বিষয়ে তথ্য জ্ঞাত হওয়া সেই একই কথা। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে যে পাঠ দেওয়া হবে তার মধ্যে যেহেতু বুদ্ধিচর্চার কোনো অবকাশ থাকবে না সেই হেতু সেটাকে শিক্ষামূলক বলা যাবে না। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় পরোক্ষভাবে। মানুষকে যদি মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে তারা মানুষের মানবিকতাবোধ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে। শিক্ষার এই ক্ষেত্রের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও পবিত্র গ্রন্থে নির্দেশিত একটি বাণীকে প্রয়োগ করা যেতে পারে: "প্রথমে তোমরা স্বর্গরাজ্যের রাজধানীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হও, ওই সন্ধানে ব্যাপৃত হলেই অন্যবিধ বস্তুগুলির সন্ধানও তোমরা পেয়ে যাবে।" যে শিক্ষাব্যবস্থা মানব সমাজকে দমিয়ে রাখার পরিবর্তে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধারার মৌল এবং প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হবে। এই শিক্ষা হবে তত্ত্বমূলক, বাস্তবানুগ নয়। কেননা, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত থাকলেও একই বোধের দ্বারা তারা চালিত হতে পারে। এই বোধটি হবে সামগ্রিক, বিশেষত্বমূলক নয়। তার কারণ, সব মানুষ একই বিষয়ে চৌকশ হতে না পারলেও, তাদের সকলের পক্ষে মূলনীতিগুলি অনুধাবন করা সম্ভব। এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে উদারনৈতিক, বৃত্তিমূলক নয়। কেননা, সব মানুষের জীবিকা একই প্রকার না হলেও তাদের মানসিক চিন্তাধারা বাধাবিপত্তিহীন হতে হবে। যে শিক্ষা-

ব্যবস্থায় মানুষকে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধনের মাধ্যমে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই জাতীয় ও বিশ্বসমাজের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হবে।

ইম্ম্যানুয়েল ক্যান্ট ব্যাপারটির বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে:

শিশুদের বর্তমানের প্রেক্ষিতে নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উন্নত মানব-সমাজের জন্য, শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা মানবতার সাধক হয়ে উঠতে পারে এবং মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে...পিতা-মাতারা ছেলেমেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দেন যেন তারা যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাদের এর চেয়েও উন্নত ধরনের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যার ফলে ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই কাজটি সাধন করতে গেলে আমরা সচরাচর দু'টি বাধার সম্মুখীন হই—(ক) পিতামাতারা তাদের ছেলেমেয়েদের শুধু এই পৃথিবীতে কর্মোপযোগী করে গড়ে তুলতে চান, (খ) আর রাষ্ট্রবর্গ তাদের প্রজাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চায়।...এদের দুজনের কারুরই বিশ্বের হিতসাধনের ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। এরা মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য ও অভীষ্টকে কোনো মূল্য দেন না। কিন্তু যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার মূলাধার বিচিত্রমুখী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের হিতসাধনের প্রচেষ্টা কি আমাদের ব্যক্তি মানুষদের, জন্য ক্ষতিকর? কখনই না! কেননা, এর জন্য কিছু একটা উৎসর্গ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতি-ভাত হলেও, এমনকি ব্যক্তিমানুষের জন্যও সুফলদায়ক কিছু গুণাবলী এতে যে রয়েছে সে বিষয়ে কোনো মতভেদ থাকতে পারে না। এর ফলে কত মহান উদ্দেশ্যের পথই না উন্মুক্ত হয়ে যাবে!"[৩]

মানুষ যদি সর্বত্রই এক প্রকার হয়

মানুষ যদি সর্বত্রই সমান হয়, যদি শিক্ষাকে মানবিক কাজেই ব্যব-হার করা হয়। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় সকলের উন্নতিসাধন তাহলে

সর্বত্রই শিক্ষাব্যবস্থা একইরূপ হওয়া উচিত। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র, জাম্বিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং কুয়েত-এর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়। মানুষকে সত্যিকার মানবিক গুণসম্পন্ন জীব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা মানব-সমাজের সর্বত্রই গৃহীত হওয়া উচিত। এতে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হবে।

সংস্কৃতি বিশেষে শিক্ষাপ্রদানের ধারা বিভিন্ন হতে পারে। এমনকি ব্যক্তি বিশেষেও এর বিভিন্নতা সম্ভব। কিন্তু উদ্দেশ্য থাকবে একই এবং আশ্চর্যজনকভাবে, বিষয়বস্তুও একই হতে পারে বহুলাংশে। সত্যকে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা আকাঙ্খার দ্বারা সীমায়িত করা যেতে পারে না। একই সত্য সব মানুষের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে পরি-গণিত হচ্ছে। একসময় আমরা যেমন বলতাম এখনও তেমনভাবে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, পদার্থবিদ্যার মূল সত্যগুলি একই হতে পারে, কিন্তু 'সভ্যতাবিবর্জিত' মানব সম্প্রদায়ের কাছে এর কোনো তাৎপর্য নেই।

নিজস্ব ঐতিহ্য অনুধাবনের উপায়

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রতিটি শিশুকে তার নিজস্ব ভাষা জানতেই হবে। বর্তমান পৃথিবীতে এই বিভেদসৃষ্টিকারী প্রভাবকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। শিশুকে, সে যে ঐতিহ্যের অংশভাগ, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। এই বোধ তাকে তার সহমানবমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এমন আশা করা যায় না। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারায় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য যদি অন্য সব জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে নিয়োজিত করা হয় তাহলে সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থাই অমূলক প্রমাণিত হয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য যদি সমঝোতাবিধান হয় তাহলে এই সুর ধরে বলা যেতে পারে যে, অন্যের সংস্কৃতি বোঝার জন্য নিজের সংস্কৃতি অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক লুইস ডব্লিউ. নোরিস প্রসঙ্গতঃ বলেছেন: "রাশিয়া বা প্রাচ্য সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা কোনো কাজেই আসবে না

যদি না এই কার্যে নিয়োজিত ছাত্রটি নিজের পারিপার্শ্বিকতা থেকে আহরিত অভিজ্ঞতার আলোকে রাশিয়া ও প্রাচ্যের সমস্যাবলী অনুধাবনে সচেষ্ট হয়।" অর্থাৎ ছাত্রটি তার নিজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে এ ব্যাপারে নাক গলান উচিত হবে না।

অধ্যাপক অনিন্দ কুমার স্বামীও বলেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পার্থক্যের নিরসন করতে হলে পাশ্চাত্যকে তার সভ্যতার অন্তর্নিহিত মূল সত্যগুলিকে অনুধাবন করতে হবে। তিনি বলেছেন, "পরস্পরের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতাই সমঝোতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। কেননা, মানুষ যতদিন না অন্য মানুষের চিন্তাভাবনার শরীক হচ্ছে ততদিন তারা পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারেনি বলে ধরে নিতে হবে। এতে শুধু পরস্পরকে জানাজানি হয়। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় বাধ হয়ে দাঁড়ায় নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। এটাই পারস্পরিক সমঝোতার ক্ষেত্রে প্রধান বিঘ্ন বলে বিবেচিত হয়।"[৪]

দুই বিশ্ব প্রজাতন্ত্র

শিক্ষাকে যদি কার্যতঃ মানুষকে সত্যিকার মানবিক চেতনাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা হয় তাহলে এর ফলে বিশ্বমানবসমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটবেই। প্রজাতন্ত্র, সত্যিকার একটি রেস রিপাবলিকা, ন্যায়বিচার, শান্তি, স্বাধীনতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতার প্রচলন ঘটাতে পারে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে। আমরা যখন শাসিত প্রজাবর্গের সম্মতির বিষয়টি উত্থাপন করি তখন আমরা মানুষকে মানুষ হিসাবেই বিবেচনা করি, স্বর্গীয় দেবদূত হিসাবে নয়। স্বর্গীয় দেবদূতদের জ্ঞান শিক্ষা এবং অনুধ্যানের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষের সে প্রয়োজন আছে। এ কারণে শাসিত প্রজামণ্ডলীর প্রতিটি স্তরসম্মতিবিদ্যার্জনের মাপকাঠিতেই নির্ধারিত হয়। আমরা বিদ্যার্থী সমাজ সম্পর্কে আলোচনার সময় এটা দেখতে সমর্থ হব যে, প্রজাতন্ত্র আসলে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে জীবনযাপনেরই ফলশ্রুতি। এটা হচ্ছে সেই আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাপনার মাপকাঠিতে

প্রতিটি রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রের গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। পঁচিশ শত বৎসর আগে থেকে অ্যাথেন্সবাসীদের সঙ্গে আমরা যে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলেছি সেটা হচ্ছে অবাধ জ্ঞানচর্চার উপযোগী একটি প্রজাতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি বৈশ্বিক প্রজাতন্ত্র। এই দু'টি একে অপরের প্রতিপূরক হিসাবে কাজ করবে এটাই আমাদের আশা।

প্রতিটি মানুষই শিক্ষালাভের উপযুক্ত। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তার জ্ঞানচর্চা লোপ পায় না। যদিনা মানুষ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা এটাকে রুদ্ধ করে রাখে। অবাধ জ্ঞানচর্চার সুযোগ-সুবিধা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। অনলসভাবে চর্চা অব্যাহত না রাখলে মানুষের কর্মজীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠাকে চিরায়ত করা যায় না। জ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ-সুবিধা এবং তা প্রয়োগের স্বাধীনতা না থাকলে শান্তি সুনিশ্চিত করা যায় না। আমরা আইন ও ন্যায়-বিচারের ধারক যে পৃথিবীতে বাস করতে আগ্রহশীল, বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক প্রজাতন্ত্রের সেই স্বপ্ন, হয় বিশ্বব্যাপী জ্ঞানচর্চার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতিরেকে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমরা যে সভ্যতায় বসবাস করতে উৎসুক সেই সভ্যতার উন্মেষ তখনই ঘটবে যখন প্রতিটি মানুষ বিশ্বব্যাপী একটি আইন, ন্যায়বিচার ও বিদ্যার্জনের উপযোগী প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হয়ে উঠবে।

এটা একবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব হতে পারে। এর অর্থ হবে শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠেছে।

৬. শিক্ষার কলাকৌশল

আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রযুক্তি-বিদ্যানির্ভর। আমরা মন্তব্য করেছি যে, যাঁরা প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন তাঁরাই এতে সাফল্যলাভ করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যর্থতাবরণ করার অর্থ দাঁড়ায় ছাত্রটি প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। 'সামর্থ্য' বলতে খুব সম্ভবতঃ জটিল শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্যই বোঝাবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের উপায়

শিক্ষার জন্য গৃহীত উপায় এর উদ্দেশ্যকে তুলনামূলকভাবে বেশী প্রভাবিত করেঃ এই উপায়গুলিই উদ্দেশ্যাবলী হয়ে দাঁড়ায়। যদি উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন, বাছাই, উত্তীর্ণ এবং স্নাতক উপাধি দেওয়া হয় তাহলে, তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে, পরীক্ষায় পাশ করাটাই বড় কথা হয়ে উঠবে। এবং সে ক্ষেত্রে তার শিক্ষার বিষয়বস্তুও এমন হতে হবে যা অবলম্বন করে তার পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারবে। সচেতনভাবে হোক আর অসচেতন ভাবেই হোক, যারা পাঠসূচি নির্দ্ধারণ করেন তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করবেন ছাত্রটি কি শিখবে তা নয়, তাকে কোন বিষয়ের উপর পরীক্ষা করা যাবে সেটি কি হবে।

শিক্ষামূলক প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি প্রয়োগ করা যায়। শিক্ষক বা ছাত্র কি পরিমাণ বোধশক্তিসম্পন্ন তা জানার প্রয়োজন নাই, চলিত ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারলেই তাকে দূরে সরে যেতে হবে।

এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে "শিক্ষামূলক ব্যবস্থা" কথাটি স্ব-বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কোনো একটি ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ব্যাপারটি কখনও শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। মানুষকে তার মানবিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যদি নির্দিষ্ট কোনো বিধি ব্যবস্থা না থাকত এবং প্রত্যেকেই যদি বাড়ীতে বসে শিক্ষার্জন করত তাহলেও আদিম এক ধরণের কলাকৌশল রপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। বই, এমনকি পাণ্ডুলিপিও শিক্ষার্জনের এক একটি যন্ত্র-বিশেষ। কিন্তু রুশো, যার সৃষ্ট এমিলির 'শিক্ষক' ছিলেন একজন, এবং লক্ কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় দায়িত্বশীল কোনো পদ পেতে পারেন না। এদের শিক্ষক বা 'উপদেশকরা' শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সব কলাকৌশল ব্যবহার করতেন যে এগুলো কোনোক্রমেই উদ্দেশ্য সাধিত করণের জন্য নিয়োজিত হতে পারত না।

কারিগরী জ্ঞান ও গণশিক্ষা

কিশোর উপদেশক এবং লকের শিক্ষককে মধ্যযুগের কারিগরদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষাবিদরা অনেকটা হেনরী ফোর্ডের সমগোত্রীয়। অর্থনৈতিক জগতে আমরা বহুজনভোগ্য-পণ্যের উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করেছি। আমাদের বিষয় আলোচনায় এটাকে বলা হয়েছে গণশিক্ষা। ১৯৬৪ সালে 'টাইম' পত্রিকায় এই পরিচ্ছেদে আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা হয়ঃ "কম্প্যুটারে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ছাত্র নির্বাচনের জন্য পরীক্ষাকার্যটি প্রতি সেকেণ্ডে দুটি করে ধরা যেতে পারে। এই যন্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের গণশিক্ষা আন্দোলনের প্রবল চাপের মুখে অসংখ্য ছাত্রের ভিতর থেকে সবচেয়ে সক্ষম ছাত্রগুলিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্যশীল ভূমিকা পালন করছে।"

একটি বিরাট জনতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাসের সূচনা থেকে গড়ে ওঠা প্রতিটি সৈন্যবাহিনীতেই এর প্রমাণ রয়েছে। শুধু সম্ভবতঃ এদেরকে তথ্যাদি সরবরাহও করা যেতে পারে। গণ-যোগাযোগ কথাটি এরই ইঙ্গিতবহ। কিন্তু এই জনতাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা।

তথ্যের যোগান ও প্রশিক্ষণের ভবিষ্যৎ

প্রশিক্ষণ এবং তথ্য জ্ঞাপন করা জরুরী সামাজিক কার্যকলাপের অঙ্গবিশেষ—এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থায় এর কোনো প্রধান ভূমিকা থাকবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পরিবর্তনের গতিশীলতা, কর্মে নিযুক্তি থাকাকালে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং অধিকতর শ্রমমুক্ত সময়, যে সময়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণের কোনো সংযোগ থাকবে না;—এ সবকিছুই শিক্ষামূলক উৎসাহের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বলে স্বীকৃত হবে।

১৯৬০-এর দশকে মনে করা হতো তথ্য জ্ঞাপনের ব্যাপারটিও এই পরিণতির সম্মুখীন হবে। বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহ,

মওজুদ, পূর্ণ প্রচার এবং বিতরণ এমন চমৎকারভাবে কার্যকরী বলে সপ্রমাণিত হয়েছিল যে, এটাকে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা বা ব্যবহার করা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তথ্যপঞ্জী মুখস্থ করে কি লাভ যদি একটি বোতাম টিপলেই তা পাওয়া যায়?

আমেরিকার আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রেরা বিভিন্ন আইনের ধারা ও পুরোন মামলার নথিপত্র ঘেঁটেই এ যাবৎ তাদের শিক্ষা আরম্ভ করেছেন। বেশীর ভাগ আইন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে তরুণ আইনজীবী ও করণিকেরা এই কাজটিই সম্পাদনা করে থাকেন। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে এতসব পরিশ্রমের কাজ কম্প্যুটারের উপর ন্যস্ত করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ফলে আইন ব্যবসা ও আইন শিক্ষার উপর কী প্রভাব পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

'ইলেকট্রোনিক ব্যাঙ্কে' তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করে বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে তা মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে বলে মাঝে-মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এই ব্যাপারটির ভয়াবহতা বিবেচনা করে আমি এ নিয়ে আর আলোচনাও করতে চাই না। এই মতের প্রবক্তারা যুক্তি দেখান যে, এর ফলে মানুষকে অকারণে পর্বতপ্রমাণ তথ্যাদি পড়তে ও জানতে হবে না। প্রতিটি তথ্যই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করা সম্ভবপর হবে। এই ব্যাপারের ভয়াবহতার কথা বাদ দিলেও এর ফলে পাঠাগার· বিশ্বকোষ এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হবে তা-ও একটা বিবেচ্য বিষয় বৈকি।

শিক্ষাপ্রদান এবং তথ্যাদি জ্ঞাপন যদি শিক্ষাব্যবস্থার মূল কর্মকাণ্ডের অংশভাগ না হয় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার আর একটিই মাত্র উদ্দেশ্য থাকবে, তা হচ্ছে: মানুষের মধ্যে বোধের সঞ্চার ঘটান। এই বোধ জাগ্রত করার জন্য গৃহীত বিধিব্যবস্থার দ্বারা এটা কতদূর প্রভাবিত হবে সেটাই জিজ্ঞাস্য।

শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকারিতা

যে কোনো কারিগরি কলাকৌশলের মূল কথা হলো কার্যকারিতার উন্নতি সাধন। অর্থাৎ, স্বল্পমূল্যে অধিক পরিমাণ উৎপাদন।

সেলিনির তৈরী মদের পাত্র নয়, প্লাষ্টিকের তৈরী পেয়ালাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিজ্ঞান-নির্ভর যুগের প্রতীক। সেলিনির স্বী মদের পাত্রটির মতই প্লাষ্টিকের পেয়ালাতেও তরল পানীয় রাখা যাবে। এই প্লাষ্টিকের তৈরী পাত্রটি সেলিনির তৈরী পাত্রের মতো অত বেশী-দিন নাও টিকতে পারে। কিন্তু এই প্লাষ্টিকের কাপ পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি পেয়ালাহীন লোককে পেয়ালা তো জুগিয়েছে বটে।

যাঁরা তথ্যাদি সরবরাহ এবং তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন তাঁরা কার্যকারিতা অর্জনের প্রচেষ্টায় আইনসম্মতভাবে ছাত্রদের কাছে সহযোগিতা দাবী করতে পারেন। অবশ্য এই কার্য-কারিতা বলতে যদি কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন জানা বোঝায় এবং প্রশিক্ষণ বলতে কতকগুলি নিয়মিত ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন বোঝায়, তাহলেই এই জাতীয় বস্তু, যদি সরবরাহ করতেই হয়, তাহলে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক লোকের নিকট সবচেয়ে কম সময়ে যাতে পরিবেশন করা যায় সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা যাতে সবচেয়ে ম খরচে সম্পন্ন করা যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রশিক্ষণ এবং তথ্যাদি সরবরাহের ব্যাপারটির জনপ্রিয় হওয়া ওই বিষয়গত শিক্ষাসূচী কত সহজে কাজে খাটান যায় তার উপরই নির্ভর-শীল। এই বিষয়ে সাফল্য অর্জনের মাত্রা অতি সহজে গণনা এবং পরিমাপ করা যায়। বোধ সম্প্রসারণে সাহায্যকারী যে কোনো কলাকৌশল আয়ত্ত করা তুলনামূলকভাবে দুরূহ বটে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোনো কার্যব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র থবা কারিগরী কৌশল সেই প্র সবচেয়ে যোগ্য মীমাংসা করতে পারে যার একটিই মাত্র সঠিক উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন-টির উত্তর যদি অসংখ্য হয় অথবা যেখানে উত্তর প্রদানের চেয়ে কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়াটাই উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয় সে-সব ক্ষেত্রে বহু বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। যে কোনো দার্শনিকের জীবনের ঘটনা-সমূহকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু

ইতিহাসে তার চিন্তাধারার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মুস্কিলের কথা হচ্ছে, মানব সম্প্রদায়ের কাছে যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিরই একাধিক উত্তর আছে। কিংবা কোনো কোনো প্রশ্নের কোনো উত্তরই নাই। এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক, সংশোধনী অথবা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যেতে পারে। সম্ভাব্য উত্তরও, যদি কোনো উত্তর থাকে, পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা চালু থাকা অতীব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের তেমন অবকাশ নাই।

শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহার

এটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ছাত্রের সংখ্যা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে অভাব পূরণ করা হয় একক্ষেত্রেও সেইভাবে, অর্থাৎ মানুষের জায়গায় মেশিন ব্যবহার করে, এই সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়। এভাবেই স্কুলগুলিতে কারিগরী কলাকৌশল ব্যবহারের আধিক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার ফলে এই চাহিদার সরবরাহ করা একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই বস্তুগুলির প্রচার ও বিক্রয় শুরু হয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানচিত্রের নীচে আমেরিকান টেলিফোন এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কোম্পানী একটি পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এই বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল: "এটি একটি বিরাটাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে—বেল সিস্টেম নেটওয়ার্ক দ্বারা যোগাযোগের মাধ্যমে।"

এই বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়:

একটি 'বেল সিস্টেম নেটওয়ার্ক'-এর সম্প্রচারণ ব্যবস্থা যে-কোনো কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে 'অডিও ভিজুয়াল' প্রণালীর সাহায্য প্রদান করতে পারে। পূর্ব থেকে রেকর্ডকৃত এবং জীবন্ত টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচী একই সঙ্গে এক বা একাধিক শ্রেণীকক্ষে সম্প্রচারিত করা

যেতে পারে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যৌথ উদ্যোগে প্রস্তুত অনুষ্ঠানসূচী, 'বেল সিস্টেম'-এর দ্বারা সংগ্রথিত অবস্থায়, অধ্যাপক এবং অন্যবিধ সুবিধা ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ প্রদান করে। 'বেল সিস্টেম' -এর 'অডিও ভিজুয়াল' শিক্ষাসহায়ক আর একটি মাধ্যমের নাম 'টেলি-লেকচার'। দ্বৈত যোগাযোগ মাধ্যম সমন্বিত এই ব্যবস্থাটি দু'টি বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে একই বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ প্রদান করে। বক্তৃতা শ্রবণের পর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রেরা বক্তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেমিনার এবং সম্মেলনেও 'টেলি-লেকচার' ব্যবস্থাকে কাজে লাগান যায়। 'বেল সিস্টেম' প্রচলিত ইত্যাকার প্রতিটি ব্যবস্থাই স্বল্প খরচে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়নে সাহায্যশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'আধুনিক' হওয়ার উদগ্র বাসনা, সেইসঙ্গে শিক্ষকের অভাব এবং বিক্রেতাদের চাপ এই জাতীয় কলাকৌশলের ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করেছে। এই সমস্ত সাহায্যকারী যন্ত্র বিক্রয়ের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় এগুলির কোনো কোনোটি যথেষ্ট পরীক্ষা না করেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে হতাশাবরণ করতে হয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রদের বাছাই, ভর্তি, শিক্ষা প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ এমন পদ্ধতিতে করা সম্ভব যার ফলে তারা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তাদেরকে 'মানুষের হাতের স্পর্শ বর্জিত' বলে অভিহিত করা যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কম্প্যুটার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কম্প্যুটারের দ্বারা শিক্ষাসূচী নির্ধারণ করাও সম্ভব। প্রতিটি শিক্ষা বিষয়ই যান্ত্রিক উপায়ে শেখান যেতে পারেঃ ছায়াছবি, ক্লোজ্‌ড এবং ওপেন সার্কিট টেলিভিশন, এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ১৯৬০-এর দশকে করা হতে থাকে। অদূর-ভবিষ্যতে বিশেষতঃ ধনতান্ত্রিক সমাজের পাঠকক্ষে নানা ধরনের যন্ত্র-পাতি শোভা পাবে বলে আশা করা যায়।

এই ব্যবস্থা গৃহীত হলে মাত্র একজন বিশেষজ্ঞই একটি দেশের পদার্থবিদ্যার সবকটি পাঠ্যসূচীই শিক্ষা দিতে পারবেন এবং একজন

তাঁকে কোনো ছাত্রের সম্মুখেই সশরীরে হাজির হতে হবে না। যদি কোনো অধ্যাপকের ব্যক্তিত্ব এবং চাল-চলন টেলিভিশন-পর্দার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে কোন অভিনেতাকে দিয়ে তাঁর বক্তৃতা পড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। ওই অভিনেতাকে চলচ্চিত্রায়িত করতে কোনো অসুবিধা হবে না। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক এবং সেকেণ্ডারী স্কুলের তিন কোটিরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর টেলিভিশন কোর্সের অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। তত্ত্বগতভাবে যে-কোনো ছাত্র কোনোদিন তার শিক্ষককে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করেও তার 'শিক্ষা' সমাপন করতে পারে। ১৯৬৫ সালে ইংলণ্ডে পরীক্ষামূলকভাবে একটি শিক্ষকহীন স্কুল চালু করা হয়। ফরাসী বিমান-বাহিনীতেও এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয় বলে জানা গেছে। শিকাগোতে একটি 'টি. ভি. কলেজ'-এর একটি কার্যবিবরণী প্রকাশ করে। এই কলেজটি সংশ্লিষ্ট শহরে গত আট বছর যাবৎ যে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছে কার্যবিবরণীতে তার উল্লেখ করা হয়। ছাত্রেরা নিয়মিত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসূচী দেখেই অ্যাসোসিয়েট ইন্ আর্টস ডিগ্রী লাভ করতে সমর্থ হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আলোটোতে পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। এখানকার প্রথম গ্রেডের এক শ' পঞ্চাশটি ছাত্র অঙ্ক এবং অন্যবিধ বিষয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্প্যুটার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। যে সব ছাত্র পিছনে পড়ে যায় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য শিক্ষক হাতের কাছেই ছিলেন। কিন্তু মূল শিক্ষাবিষয়গুলি টেলি-টাইপের মাধ্যমেই পৌঁছে দেওয়া হয়। কম্প্যুটার প্রশ্নগুলি ছাত্রদের সমীপে পেশ করে এবং এর উত্তর প্রদানের সময়ও নির্দিষ্ট করে দেয়। উত্তর শুদ্ধ হলে তা-ও জানিয়ে দেয়। আঙ্কিক সমস্যাটি $8\frac{1}{2} \times 11$ ইঞ্চি আকারের একটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়।

কম্প্যুটারটি ওয়াশিংটনে থাকতে পারে অথবা—পিকিং-এ। পর্দাটি বাড়ীতে থাকতে পারে। শিক্ষকের ভূমিকা হতে পারে তত্ত্বাবধায়কের

মত। ছাত্ররা কিভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে তিনি তা পরিদর্শন করতে আসতে পারেন। যান্ত্রিক কলাকৌশল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে দূরত্ব, সময় এবং কর্মীর অভাবজনিত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেছে। আমরা শুধু জিজ্ঞেস করতে পারি এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে শিক্ষা বিনষ্ট হবে কিনা।

বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সাধনের উপায়

স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন বলেছেন, গ্রীকরা অ্যায়েস্কিলিয়ান ত্রিখণ্ড-শেষ নাটক বেতারে সম্প্রচারিত করতে পারতেন না; কিন্তু তারা এটা লিখতে পারতেন। আমরা, তেমন পরিবেশক পেলে, এটা সম্প্রচারিত করতে পারি। কিন্তু আমরা কি ওই ধরনের নাটক লিখতে পারি? আমরা যদি না পারি তাহলে আমাদের অপারগতার কারণ হিসাবে বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলকেই দায়ী করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক কলাকৌশল আমাদেরকে ওই ত্রিখণ্ড-শেষ নাটকের মূল সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। উপরন্তু, টেলিভিশনের জন্য কোনো নাট্যকার অমন মহতী বিষয় অবলম্বন করে নাটক লিখবেন এও মনে হয় না। তা ছাড়া একটি উপন্যাস ও ওই উপন্যাস অবলম্বনে প্রণীত একটি নাটক, ওই নাটক অবলম্বনে তৈরী ছায়াছবি এবং ওই ছায়াছবি অবলম্বনে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রণয়নের মধ্যে কতকগুলি মৌল পার্থক্য থাকবেই। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে।

উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ও গুণগত মান

শিক্ষা প্রসঙ্গে কার্যকারিতার কোনো স্থান নেই একথা সুনিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। কার্য-কারিতা বলতে দ্রুততা, সুবিধা, খরচের স্বল্পতা এবং বৃহত্তর বাজারের সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা নীচু মান স্বীকার করে নিতেও রাজী আছি।

যাঁরা শিক্ষকের অভাবজনিত অসুবিধা যন্ত্রের সাহায্যে দূর করতে চান, তাঁরা সমানুপাতের তুল্যতা বিচারে সরলতার শিকারে পরিণত হন।

বহুভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এই ব্যবহারবিধি যেখানে সুবিধা প্রয়োগও করা যেতে পারে। বিপুল সংখ্যায় মানুষ উৎপাদনেও এই নিয়ম কার্যকরী করা সম্ভব বলে যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে তার মূলেও আছে এই যন্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা। কিন্তু, এটা মনে রাখতে হবে যে, 'অ্যাসেম্বলী লাইনে' পণ্য-উৎপাদন সম্ভব হলেও, মানুষ উৎপাদন সম্ভব নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে তার সার্বিক গুণসমূহের বিকাশে সাহায্য করা। হেনরী ফোর্ডের অনুসৃত পন্থা এই উদ্দেশ্য সাধনে কোনো কাজে আসবে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা, রেঁনে ডুবো বলেছেন, বৈচিত্র্যসাধন খুবই জরুরী। শুধু সমাজের গড়ে ওঠার জন্যই যে এর প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, সমাজের টিকে থাকার জন্যও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষের বহুমুখী বৈচিত্র্যই সমাজকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। শিক্ষক মানুষের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে তা সনাক্ত ও তার পরিচর্যা করতে পারেন।

কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে চাই এবং প্রত্যেকের জন্য যদি অভিভাবক অথবা শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে আমরা গণশিক্ষা সমস্যাটির সমাধান করব কিভাবে? আমরা নতুন কারিগরী বিদ্যায় যে সমস্ত পরিবর্তনের সূচনা ঘটছে তার গুণগত মানই বা কিভাবে নির্ধারণ করব? আমরা জানি যে, অসংখ্য আশাহত শিক্ষক ও ছাত্রের প্রয়োজন মিটাবার জন্যই যান্ত্রিক কলা-কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্জনের জন্য যে পরিশ্রম ব্যয়িত হয় এবং তার তুলনায় যে ফললাভ ঘটে তার মধ্যে বিরাট একটা অসমতা রয়েছে। এটা শুধু সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার বিচ্ছেদের একক ফল নয়। শিক্ষাদানে ইচ্ছুক শিক্ষকদের খুঁজে বের করায় ব্যর্থতাও এ জন্য দায়ী। ১৯৬৫ সালে বার্কেলীতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে বিক্ষোভ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তার মূলে আছে শিক্ষাদানের প্রচলিত কলা-কৌশলের ব্যর্থতা।

নতুন পদ্ধতির মূল্যমান

নতুন পদ্ধতিগুলি অতীতের কলাকৌশলের কবর রচনা করবে, এটা একটা বিরাট লাভ।

নিয়মবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি চলিত প্রথার মূলোৎপাটন করতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের মত করে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ছায়াছবি এবং টেলিভিশনের সাহায্যে উন্নত এবং সফলকাম শিক্ষকদের বক্তৃতা সম্প্রচারিত করা যেতে পারে। এতে অযোগ্য শিক্ষকের চেয়ে যোগ্য শিক্ষককে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। (কোনো শিক্ষক যদি বক্তৃতাই দেন, তাহলে তার বক্তৃতা যাতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক শুনতে ও দেখতে পারে সে ব্যবস্থাই করা উচিত।) বৈজ্ঞানিক অথবা শিল্পমূলক যে-কোনো প্রতিলিপি পাঠকক্ষে নিয়ে আসা যেতে পারে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে সাধিত যে কোনো পরীক্ষামূলক গবেষণা চিত্রায়িত করে তা হাজার হাজার ছাত্রকে দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা আগেও বলেছি, পাঠ-কক্ষ বলতে যা বোঝায় তার প্রচলন উঠিয়ে দেওয়াও সম্ভব। সমস্ত প্রকার শিক্ষাই এককভাবে বাড়ীতে অথবা ছোটো ছোটো দলে যে-কোনো সুবিধাজনক জায়গায় একত্রিত হয়ে অর্জন করা যেতে পারে। উচ্চতর পর্যায়ে মাইক্রোফিল্ম এবং কম্প্যুটারের সাহায্যে গবেষণার কাজ আরও সহজসাধ্য করে নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে জায়গা এবং সময়ের অভাবজনিত সমস্যা দূরীভূত হবে। ভ্রমণ এবং হিসাব-নিকাশের পরিশ্রম থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

শুধু তথ্য আহরণের প্রশ্নটাই যেখানে প্রধান সেখানে এই নতুন পদ্ধতিসমূহ অত্যন্ত সুচারুভাবে কাজে লাগান যেতে পারে। এই ব্যবস্থা পূর্বেকার যে-কোনো ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত।

শিক্ষামূলক কলাকৌশল নিয়ন্ত্রণ

সাধারণভাবে যান্ত্রিক কলাকৌশল নিয়ে যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, শিক্ষামূলক কলাকৌশল নিয়ে সেই একই সমস্যা দেখা দেয়ঃ

এটাকে কি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? যদি স্বাধীনভাবে কাজে প্রয়োগ করা যায় তাহলে এই নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলি ট্রেনিং গ্রহণ, মুখস্থ করা প্রয়োজন এমন বিষয়ে সাহায্য, প্রমোদ বিতরণ এবং তথ্যাদি জ্ঞাপনের ব্যাপারে সাহায্যকারী বলেই প্রমাণিত হবে। কার্যকারণ বিশ্লেষণ এবং চিন্তা-ভাবনা আরোপের কোনো অবকাশ এতে থাকবে না। কেননা, এই নতুন পদ্ধতিতে এগুলো করিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় থাকবে না। এই যন্ত্রগুলি আলোচনার ব্যাপারটিকে সীমায়িত করে দেবে, তার কারণ, যন্ত্রের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করা কঠিন ব্যাপার। এই পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে তুলবে, এর ফলে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব হবে। এর ফলে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও আর তত বেশী থাকবে না। শিক্ষকেরা কর্মহীন হয়ে পড়বেন। কেননা, জার্মানীর সেই রুটির কারখানাতে যেমন, স্কুলগুলিতেও তেমনি অশিক্ষিতা নিরক্ষর স্পেনীয় মহিলারাই কাজ চালাতে পারবেন। এর ফলে মানবিক গুণ উন্মেষের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানে মানুষের স্বভাবজ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করা হবে। এই পদ্ধতিগুলি গণশিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাকে দুরূহ, জটিল ও অমীমাংসাযোগ্য করে তুলবে।

যান্ত্রিক কলাকৌশল স্বয়ংনির্ভর ও মানুষ ইচ্ছা করলেই এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে পারে, অধ্যাপক আর. জে. দোর্‌বস এই মতের বিরোধিতা করেছেন।[১] তাঁর মতামত যদি সঠিক হয় তাহলে এই নতুন প্রয়োগ পদ্ধতি যেখানে সুযোগ্যভাবে কার্যকরী করা যায়, সেখানে কাজে লাগান হবে আর যেখানে তা হবে না সেখানে কাজে লাগান হবে না। এই নতুন কলাকৌশল শিক্ষাব্যবস্থাকে জায়গা, সময় ও কর্মীসমস্যা থেকে রেহাই দিয়েছে এই কথাটি মনে রাখলে আমরা কোথায় এবং কিভাবে শিক্ষার মান বজায় রেখেও জায়গা, সময় ও কর্মীসমস্যা নিরসনে একে ব্যবহার করতে পারব তা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হতে পারি।

এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সমস্যাটিকে লঘু বিবেচনা করা উচিত নয়। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্দেশ্য অর্জনকে প্রভাবিত করে, এটাই হলো সাধারণ নিয়ম। যে বস্তু (এবং ছাত্রসমূহ) যান্ত্রিক কলাকৌশলের

যারা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বোধবুদ্ধি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। তার কারণ, যন্ত্রের এ ব্যাপারে কার্যকরী কোনো ভূমিকা নির্ধারণ করা দুরূহ প্রতিপন্ন হবে। কম্প্যুটার অথবা টেলিভিশনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা খুবই যত্ন ও পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে সম্যক অনুধাবনে সাহায্য করার জন্য অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়নকারীরা যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু এটা নিয়ম ও তথ্যপঞ্জী জ্ঞাত করানোর চেয়ে কঠিন কাজ বৈকি। ছাত্র-নির্বাচন পরীক্ষা কম্প্যুটারের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে দু'টি করে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এর সাহায্যে ছাত্রটির চিন্তাশক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাকে মুখস্থ করা বিষয়েই প্রশ্ন করার সম্ভাবনাটা থাকে অধিকতর।

ম্যাইউটিক্‌স (Maieutics)

বোধবুদ্ধির সম্প্রসারণে কার্যকরী কলাকৌশলটি হচ্ছে 'ম্যাইউটিক্‌স'। সক্রেটিস এই পদ্ধতিটির সাহায্যে মূল ধারণাসমূহের ব্যাখ্যা ও নিরাকরণ করতেন। এটা হচ্ছে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চানির্ভর ধাত্রীবিদ্যা। এই শব্দটির উৎপত্তিও হয়েছে এই ধারণা থেকেই।

ভবিষ্যতে কখনও হয়ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ধাত্রীর কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে হয়ত শিশুমৃত্যুর হারও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে। মানসিক কার্যে সহায়তাকারী ধাত্রীর প্রচলনও অসম্ভব নয়। এর ফলে যান্ত্রিক কলাকৌশলের যূপকাষ্ঠে হয়ত তত বেশী মানুষকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু যতদিন না এই ধরনের কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন বুদ্ধিচর্চার ধাত্রীসুলভ পরিচর্যা মানুষকেই করতে হবে। তাদের অবস্থা অবশ্য সক্রেটিসের থেকে ভিন্ন হবে। তারা একটি বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন।[২] মানুষকে তখন আরও কঠিন আমলাতান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

অপরপক্ষে, পুরোন কলাকৌশলের বিনাশ এবং তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যে সময় ব্যয় হয় তা সংক্ষেপিত হয়ে যাওয়ার ফলে

শিক্ষকেরা অনেক অনাবশ্যক ভার থেকে মুক্ত হতে পারবেন। নতুন যান্ত্রিক কলাকৌশল, যদি তা সবিশেষ বিবেচনা সহকারে কাজে লাগান হয়, শিক্ষকদেরকে পরিশ্রমসাধ্য বহু কাজ সহজে ও অনায়াসে সম্পন্ন করার সুযোগ এনে দেবে।[৩] নতুন যান্ত্রিক কলাকৌশলের ব্যবহারযোগ্যতা একে পুরোন ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর কার্যোপযোগী প্রতিপন্ন করেছে।

'ম্যাইউটিক্‌স' কার্যধারা কাজে খাটান হবে কি না তা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং মনোভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। এটা আবার পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়ের উপর তারা কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন তার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৭. সকলের জন্য উদার শিক্ষাব্যবস্থা

কেনিয়ার কেরিকো জেলায় আমি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছবি নিতে যাই...জেলা প্রশাসক বললেন, "এইসব ছেলেমেয়েদের খুব কম সংখ্যকই আরও বেশী শিক্ষার সুবিধা লাভের যোগ্য বলে আমাদের মনে হয়।" আমি 'আরও বেশী' বলতে তিনি কি বোঝাতে চান তা জানতে চাইলাম। "নয় বছর বয়সের ঊর্ধ্বে।" উত্তর দিলেন তিনি।

আমার তখন কলোরাডোর আলবার্ট কাউন্টির একটি স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। আমি যে গ্রীষ্মে ওখানে ছিলাম সেই গ্রীষ্মে ওই স্কুলের সব উত্তীর্ণ ছাত্রই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে দু'টি সিদ্ধান্তের একটিকে মেনে নিতে হবে। একটি হচ্ছে: আলবার্ট কাউন্টির ছেলেদের স্বভাবজ মানস গঠন কেনিয়ার কেরিকো জেলার ছেলেদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ উন্নত...অন্যটি হচ্ছে, বেশীর ভাগ শিশুই যে শিক্ষা তারা পায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে। পিতামাতা, শিক্ষক, জাতীয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কি দৃষ্টিতে তাদের দেখেন তার উপরই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল...এর ফল দাঁড়ায় এই যে, দশ বছর বয়সে কেনিয়াতে সে গরু চরানোর কাজে লিপ্ত হয়। তার কারণ কেনিয়াতে তার কাছ থেকে ওই বয়সে এটাই আশা করা হয়। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বছর বয়সে দেকার্তে অধ্যয়ন করে যে তরুণ, তার পিছনেও ওই একই কারণ রয়েছে। কারণটা হচ্ছে, ওই বয়সে তার কাছে ওটাই আশা করা হয়।[১]

টি. এইচ. হাক্সলী মন্তব্য করেছিলেন যে, নবজাতক শিশু মেথর কিংবা দোকানী অথবা বিশপ কিংবা ডিউক হয়ে পৃথিবীতে পদার্পণ করে না। উপরোক্ত মন্তব্যসমূহে এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিটি নবজাতক শিশুই জন্মকালে এক রকম দেখতে হয়। লাল একটি রক্ত-মাংসের শিশু। আমরা প্রত্যেককে যথাযথ শিক্ষাদান করলেই শুধু এদের যথার্থ

যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি। দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি থেকে ১০০ এবং নিম্নশ্রেণী থেকে ১০০ লোক বেছে নিলে তাদের ভিতরে যোগ্যতার কোনো তারতম্য থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না।[২]

এই বক্তব্যগুলি শিক্ষা সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধের সংজ্ঞাকে সমর্থন করে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেই শিক্ষা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। এ ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ নাই।

প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তোলার সমস্যাটি যে আর বেশীদিন এড়ান যাবে না সে সম্পর্কেও এই প্রবন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তথাপি. বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষাব্যবস্থার তরুণদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং জাতিভিত্তিক শিল্পসংস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের যে কার্যপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার সঙ্গে মূল বিষয়ের কোনো যোগাযোগ নেই। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কার্যপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমরা ইতিপূর্বেও একাধিকবার প্রচেষ্টা এবং তার ফলাফলের বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

জাতিভিত্তিক যে রাষ্ট্র নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য জনগণকে সজ্ঞান, সচেতন ও বোধশক্তিসম্পন্ন করে তুলতে সহায়ক হয়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই কার্যসিদ্ধির জন্য কিছুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করা হলেও এই শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো উপায় তারা বের করতে পারেনি। উপরন্তু, অধিকাংশ রাষ্ট্রই এটা অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছে। এই কার্যসিদ্ধির জন্য তারা বিকল্প কোনো কার্যসূচী প্রণয়নেও ব্যর্থ হয়েছে।

সংস্কৃতি—বিশেষত : টেলিভিশন

গত ৮০০ বছরের ইতিহাস সব মানুষের মুক্তি ও শিক্ষালাভের পথকে প্রশস্ত করলেও এবং আইন ও বিধি-বিধান শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হলেও যে সব দেশে সার্বজনীন শিক্ষা

বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে সব দেশই যে গণতন্ত্রসম্মত অথবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিকতর সমর্থন দিচ্ছে তা বলা যাবে না। আরনোণ্ড টয়েনবীর সঙ্গে একমত হয়ে প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এ পর্যন্ত সাধারণ গণমানুষ যে শিক্ষা পেয়েছে তার ফলে তারা তাদের পরিবেশের দাস হয়ে পড়েছে—ততটা আত্মনির্ভর তথা নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারেনি।

অধ্যাপক টয়েনবি প্রসঙ্গতঃ ইংলণ্ডে সস্তা সাংবাদিকতার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন সার্বজনীন শিক্ষা বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করার মত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই জনপ্রিয় এবং সস্তা পত্রিকাগুলির প্রচলন শুরু হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শিত টেলিভিশন প্রত্যক্ষকারী প্রতিটি দর্শক এ ব্যাপারে অধ্যাপক টয়েনবীর সঙ্গে একমত হবেন। এই টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সময় দর্শককে সরকারী এবং বেসরকারী বিজ্ঞাপনের প্রচারণার চাপ সহ্য করতে হয়। অথচ দর্শকেরা যা চান তাঁরা তাই পরিবেশন করেন, টেলিভিশন কর্মকর্তাদের এই উক্তির প্রতিবাদ এ যাবৎ করা হয় নি।

বিদ্যার্থী সমাজ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব। একটি ব্যাপারেই আমরা এখন মনোনিবেশ করব। সেটি হচ্ছে অধ্যাপক টয়েনবীর রোগ নিরাময় ব্যবস্থা। তিনি বলেছেন, সবাইকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপন-বিমুখ হয়ে ওঠে। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অন্যায় চাপ পড়বে বলে মনে হয়। স্কুলে শিশু একটি দিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে থাকে। সপ্তাহ এবং বছরের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। বাকি সময়টা সে টেলিভিশন দেখেও কাটাতে পারে। টেলিভিশনে শিশু যা দেখে তা যেহেতু বিশারদ এবং অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, সেইহেতু শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এই বিষয়টির প্রতিযোগিতা অসম হয়ে পড়ে। সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার বিরোধের এটা একটা অন্যতম নজির। সংস্কৃতির উপর এটাই একমাত্র চাপ। এবং এই চাপ চূড়ান্ত না-ও হতে পারে।

লেইবনিজ বলেছেন, "আমি সমাজ সংস্কার করা সম্ভব হবে বলে মনে করি। তবে শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর সংস্কার করা সম্ভব হবে সেটার উপরই এটা নির্ভরশীল।" সমাজ সংস্কার না করে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা যায় কি-না সেটাই ভেবে দেখতে হবে। সমাজ হয়ত শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা সংশোধিত হতে অস্বীকার করবে। তা ছাড়া, সমাজ যা সমাজের তা হয়ে ওঠার পিছনে শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আরও বহুবিধ ব্যাপার জড়িত আছে।

সার্বজনীন শিক্ষা ও সার্বজনীন জ্ঞান

বাণিজ্যিক বেতার ব্যবস্থার ঘোষকেরা শিক্ষাব্যবস্থাকে দর্শকদের নীচু মানের রুচির জন্য দায়ী করে থাকেন; কিন্তু সার্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা কোনদিনই করা হয় নি। প্লেটোর সময় থেকেই এই মতবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধাতুতে তৈরী। আর অ্যারিস্টটল তো এই সিদ্ধান্তের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন যে, কিছু লোক দাস এবং কিছু লোক প্রভু হয়েই জন্মগ্রহণ করে, এটা তাদের প্রকৃতিদত্ত গুণ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত ধারাগুলিও এই মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এই ঘোষণাপত্রের রচয়িতা তাঁর অন্যান্য রচনা-বলীতে তিন বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়ার পর ছাত্রদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য বাছাই করার সুপারিশ করেছেন।

ব্রিটেনিকা বিশ্বকোষের একটি পুরোন খণ্ডে স্কুল এবং শিক্ষাসূচী সম্পর্কে বলা হয়েছে:

প্রতিটি শিশুর জন্য সেকেণ্ডারী স্কুলে বিদ্যার্জনের ব্যবস্থা করা আর গুটিকয় শিশুকে বিশেষ এক ধরনের সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষা প্রদানের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য আছে। এর ফলে সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন বর্তমানে তাঁরা সেই একই শিক্ষা বহুসংখ্যক ছাত্রবর্গকে দেওয়ার কাজে যে লিপ্ত হলেন তা নয়। এইসব শিক্ষকবর্গকে বিভিন্ন ধরনের ছাত্রের যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুসারে

পাঠ্যসূচীও প্রণয়ন করতে হয়। ব্যাপারটা যত সহজে বলা হলো ততো সহজে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। কেননা, শিশুদের শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা জনে জনে ভিন্ন হয়। তা ছাড়া, কোনো একটি ছাত্রের বিশেষ প্রবণতা বা যোগ্যতাকে তার ছাত্রজীবনের অনুষঙ্গ বলে বিবেচনা করা খুবই অসুবিধাজনক।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি হচ্ছে: বিশেষ প্রবণতা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনসমূহ। এগুলো আবার স্কুলজীবনের বিভিন্ন পর্যায়েও একই প্রকার থাকে না। ফলতঃ একটি সার্বিক শিক্ষাসূচী প্রণয়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি যে নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদেরকে প্রদত্ত শিক্ষার সব সুযোগ সকলকে দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মত প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হলো বিভিন্ন কাজের উপযোগী লোক বাছাই করা এবং তাদেরকে তাদের পছন্দসই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এই ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে টমাস জেফারসনের চিন্তাধারার মিল লক্ষ্য করা যায়। টমাস জেফারসনও যারা কমনওয়েলথ শাসন করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম এবং যারা শ্রমিক হওয়ার যোগ্য তাদের বাছাই করার কথা বলেছিলেন। শাসকদেরকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, বাকিদেরকে ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে অথবা তথ্যবিদ করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু সকলেই যদি কমনওয়েলথ শাসনের উপযোগী হয়—তাহলে? অথবা এমন হবে কি?

ব্যক্তি মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে মতবিরোধের কোনো অবকাশ নাই। প্রাথমিক শিক্ষার কার্যপ্রণালীতে এবং উচ্চ শিক্ষার বিষয়সূচীতে এই পার্থক্য নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যে বস্তুটির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব মন আছে এবং প্রত্যেকেরই এই বস্তুটি ব্যবহারের প্রবণতা, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিজ্ঞান, কারিগরি কলাকৌশল এবং শিল্পসমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর (কমন্‌ওয়েলথ) দাবী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই দাবী শুধু ট্রেনিং-দান ও তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে মেটান সম্ভব নয়। টি. এইচ. হাক্সলী এই জন্যেই বলেছেন যে ভাল শ্রমিক তৈরী করা অত্যন্ত উঁচু-দরের কাজ, কিন্তু বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরী করা তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[৩] প্রত্যেককে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা পূরিত হবে না। তখন মানুষ নিজেকে রাজনৈতিক জীব হিসাবে বিবেচনা করতে ঘৃণাবোধ করবে। তখন আমলাতন্ত্রের অধীনে বাস করতে হবে মানুষকে। তখন হয়ত তার কোনো কোনো অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের অধিকার সে পাবে না। মানুষকে তখন শুধু খাওয়া আর পরা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

জ্ঞানের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

বিশ শতকের মানুষ দু'টি স্মরণীয় সংবাদ রচনা করেছে। আমেরিকা আবিষ্কারের ঘটনার পর এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রচনা আর সম্ভব হয়নি। মানুষ অণু বিভাজিত করেছে এবং এই গ্রহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে। মানুষকে এখন এ কথা বোঝান সম্ভব যে, ভবিষ্যতে তার উত্তরাধিকারীরা সবকিছু কিভাবে পরিচালিত হয় তা জানতে ও পরিচালনা করতে পারবে। আবার মানুষের মনে এই সন্দেহও প্রকট হয়ে উঠতে পারে যে, তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা জ্ঞান ও শক্তি ব্যবহারে হয়ত যথাযোগ্য বিবেচনার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে না। ভবিষ্যতের মানুষ জ্ঞানী হবে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ জাগতে পারে।

কোন শিক্ষাব্যবস্থাই ছেলেমেয়েদেরকে জ্ঞানী করে তুলতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেচনা এবং সাধারণ জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সতেরো বছর বয়সে কেউ যদি জ্ঞানী হয়ে ওঠে তাহলে সেটা আশ্চর্য বিষয় হবে। শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে তার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন

করার উপযোগী করে গড়ে তোলে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে সে আরও জ্ঞানী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। যাদুকরের কাছে শিক্ষারত ব্যক্তি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলার পরও নিজেকে আয়ত্তাধীন শক্তির কৃপার পাত্র হিসাবে দেখতে পায়। তখন তার একমাত্র সহায় হচ্ছে জ্ঞান।

বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে। হোমো স্যাপাইন নামক স্তন্যপায়ী জীবকে মানুষ হয়ে ওঠার আগে বহু স্তর পার হতে হয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের তুলনায় তার জন্ম প্রায় একবছর আগে ঘটে। তিমি শিশু দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুট হয় এবং জন্মের পর পরই পানিতে দৌড়োড় করতে থাকে। মানুষশিশুকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আগে প্রায় একবছর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। এরপরও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তার কয়েক দশক সময় ব্যয়িত হয়ে যায়। নিজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহকে আবিষ্কারের জন্য মানুষকে জীবনভর শিক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত থাকতে হয়।

জ্যাক্ মারিটেইন-এর বক্তব্যানুসারে "শিক্ষা মানে জন্তুকে ট্রেনিং দেওয়া নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা।" মানুষ হয়ে ওঠার মূলে একটি বিষয় খুবই জরুরী। সেটা হচ্ছে, মস্তিষ্ক ব্যবহারের শিক্ষা। মানুষ তখনই মানুষের মত আচরণ করে যখন সে চিন্তা করে।

"যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার আদর্শ" (১৯৩২) শীর্ষক পুস্তকে অ্যালবার্ট জে. নোক বলেছেন: শিক্ষাপ্রদানের যোগ্য মানুষের সঙ্গে শিক্ষার অযোগ্য মানুষের প্রভেদ একটিই। শিক্ষা প্রদানের যোগ্য ব্যক্তির কোনো একদিন চিন্তাশীল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটুকু থাকবে।" বিশ্বব্যাপী যে শিক্ষার চাহিদা রয়েছে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব মানুষকে চিন্তাশীল করে গড়ে তোলার শিক্ষা। প্রত্যেকেরই যেহেতু মস্তিষ্ক আছে, সুতরাং প্রত্যেকেই যে সেটা ব্যবহার করতে শিখবে, এই সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য মাত্র একটিই। সেটি হচ্ছে সবাইকে উদারভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তার কারণ সকলেরই

মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার অধিকার আছে। ১০০ বছর আগে এ ব্যাপারে হাক্সলী যা বলেছিলেন আজও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

রাজনীতিকরা বলেন, "তোমাদের উচিত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, তার কারণ তারাই হচ্ছে ভবিষ্যতের শাসক।" যাজক সম্প্রদায়ও এই একই কথা বলেন। তাদের ধারণা মানুষ ক্রমশঃ গির্জার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে এবং ধর্মবিরুদ্ধ কার্যাবলীতে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদক এবং পুঁজিপতিরাও এই ঐক্যতানে শরিক হতে দেরী করেন না। পুঁজিপতিরা বলেন, অজ্ঞতা অপটু শ্রমিকের দল বৃদ্ধি করে। তারা বলেন, ভবিষ্যতে ইংলণ্ড অন্যান্য দেশের তুলনায় কম দামে সুতা কিংবা বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন তৈরী করতে পারবে না। এর ফলাফল হবে সাংঘাতিক। আমাদের গৌরব আর থাকবে না। এরই মধ্যে কতকগুলো লোক এ কথাও বলেন যে, জনগণকে শিক্ষা দিতেই হবে, তার কারণ এদের মধ্যে অসীম সম্ভাবনাময় নারী-পুরুষের অভাব নেই। মানুষ জ্ঞানের অভাব বশতঃই ধ্বংস হয়ে যায়, এ কথা চিরকাল যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য আছে।[৪]

উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার মূলনীতিগুলি কি হবে তা অনুমান করা যায়। এর উদ্দেশ্য হবে মনুষ্যত্ব অর্জন, মনুষ্যশক্তির উৎপাদন নয়। তরুণদেরকে সমস্ত কিছুর জন্য এই ব্যবস্থায় তৈরী করা হবে। যে কোনো পরিস্থিতিতে এই শিক্ষা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা যুব সম্প্রদায়কে দুই বিশ্ব প্রজাতন্ত্রের উপযোগী নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে জীবনভর বিদ্যাচর্চার সুযোগ এনে দেবে। এই ব্যবস্থা মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করবে। মানুষকে নিজের ও বিশ্বসমাজের হিতসাধনের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করবে এই শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে সেবা

[illegible] [illegible] করবে। এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের কর্মজীবনে [illegible] কার্যকর হবে।

এ সবই চিন্তা করার অভ্যাস থেকে অর্জন করা সম্ভব। চিন্তাকে [illegible] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করার উপরও এটা নির্ভরশীল। [illegible] কোন্‌টা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর কোন্‌টা তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় তা নির্ধারণের উপরই নির্ভরশীল। এর জন্যেই কাজে এবং চিন্তায় সমালোচনামূলক তাৎপর্য আরোপের প্রয়োজনীয়তা দেখা [illegible]।

এই ধরনের শিক্ষায় কোনো বিশেষ চিন্তাধারার প্রতি একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগের অবকাশ নেই—শুধু সত্যানুসন্ধানে একনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া। কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথাও ওঠে না, [illegible] [illegible] [illegible] নামান্তর। উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা কিংবা তথ্য অথবা বিশেষ তত্ত্ব অনুধাবন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মহৎ শিক্ষকেরা যে কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন। প্লেটো 'লজ'-এ বৃদ্ধদের নৃত্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। মহৎ শিক্ষকও প্লেটোর মতই, গভীর তত্ত্বমূলক চিন্তা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা যাতে সবচেয়ে সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতিটি শিক্ষকই সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস, ইতিহাসের মাধ্যমে তথ্যজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে গবেষণা শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত আছেন। ভাবধারা ও সমালোচনামূলক মান নির্ধা-রণের চেয়ে এগুলো সহজ বলেই এগুলোর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এগুলোর সাহায্যে [illegible] পরীক্ষা করাও সহজ।

এ কারণেই প্রখ্যাত এক মার্কিন শিক্ষাবিদের সঙ্গে স্বয়ংনির্ভর ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার বিষয়ে উদারনৈতিক মূল্যমান প্রয়োগের ব্যাপারে একমত হওয়া যায় না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ওই মূল্যমানের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তার তাৎপর্য অনু-সন্ধান করতে হলে প্রতিভার প্রয়োজন আছে। আমি যে শিক্ষাবিদের

উক্তি উদ্ধার করছি তিনি বলেন: "এই ধরনের একটি শিক্ষাসূচী সম্পর্কে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়। বাষ্পচালিত চাকা মোটরযান চালু করার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এর সঙ্গে ওই ক্ষেত্রে চাকুরী বিনিয়োগের কি সম্পর্ক আছে? ...এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, এমনকি নির্দিষ্ট এবং বাস্তবানুগ বিষয়সূচীর ক্ষেত্রেও, যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাকুল হয়ে উঠতে পারে এবং এতদ্বারা উদার শিক্ষাব্যবস্থার অংশভাক্ হয়ে উঠতে পারে।"

এটা হয়ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। কোনো শিক্ষক এমন প্রশ্ন উত্থাপন করবেন সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর সংশ্লিষ্ট ছাত্রটি বাষ্পচালিত চাকার মেরামত ও তত্ত্বাবধান করা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করবে বলেও মনে হয় না।

যে শিক্ষাবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তার সম্মানে আমি তার রচনার আরও কিছু অংশ উদ্ধার করছি: "মানুষ সত্যিকার বাস্তবানুগ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে চলতি কথায় যাকে 'বাস্তবানুগ শিক্ষা' বলা হয় তার প্রতি উদাসীন হয়ে উঠবে।......কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রসার ঘটবে চিন্তাভাবনাকে মুক্ত করার ব্যাপারে সহায়ক বৃত্তি-গুলির। কেননা, এটার উপরই প্রথমোক্ত ব্যাপারে সাফল্য অর্জন নির্ভর-শীল।" আমরা আগেও বলেছি, চাকুরি প্রাপ্তির জন্য মুক্ত চিন্তার অধিকারী মানসিকতার প্রয়োজন নাই। শিল্পসংস্থাগুলি সম্মানপত্র, উপাধিপত্র, ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী দাবী করে—মুক্তমনা চিন্তাবিদ নয়। এই ভুল সিদ্ধান্তটির কথা বাদ দিলে, এই মন্তব্যে, সবচেয়ে বাস্তবানুগ শিক্ষা যে সবচেয়ে বেশী তত্ত্বমূলক, এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে।

উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জন ডিউই'র বক্তব্য

ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে তথ্যের যে উপযোগিতা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার যে উপযোগিতা, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং শিল্প কারখানার জগতে স্বয়ংচালিত যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার মেরামতের অভি-জ্ঞতার ভূমিকাও সেইরূপ। সবকিছুই প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। যদি বোধের প্রসারের জন্যই পাঠ্যসূচী প্রণীত হয় তাহলে তথ্য, গবেষণা-

সমূহ। এমনকি স্বয়ংচালিত যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যাপারটিও বোধগম্যতার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বয়ংচালিত যন্ত্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সমীক্ষাকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বোধগম্যতা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জটিলতা রুশদের মার্ক্স, এ্যাঙ্গেলস, লেনিন এবং ক্রুপস্কায়ার বিধিনিষেধ ও মার্কিনদের জন ডিউই-এর উপদেশ মেনে চলার চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

জন ডিউই-এর মনোভঙ্গি তাঁর গণতন্ত্র এবং শিক্ষা (ডেমোক্রেসি এ্যাণ্ড এডুকেশন, ১৯১৬) পুস্তকে বিধৃত আছে। তিনি বলেছেন: "বাস্তবতা এবং দার্শনিকতার দিক দিয়েও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার সমাধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের ক্রমিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। এই সরঞ্জামগুলোকে সামাজিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে এর অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তিসুলভ এবং নৈতিক মানগুলি প্রকটিত হয়ে ওঠে।"[৫] অতঃপর 'শিক্ষার দর্শন' (ফিলসফি অব এডুকেশন) পুস্তকে তিনি বলেছেন, "উদারনৈতিক আর্টস কলেজগুলিকে গণতান্ত্রিক সমাজে তার সত্যিকার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সমাজে যে কারিগরী বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলি যাতে মানবিক দৃষ্টিকোণ অর্জন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।" গণতন্ত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থে তিনি আবার বলেছেন, "সত্যিকার কোনো উদারনৈতিক শিক্ষা বৃত্তিমূলক ট্রেনিং-এর কোনো পর্যায়েই এটাকে সামাজিক, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে আলাদা করে ফেলার প্রয়াস পাবে না। এগুলোর আওতাতেই প্রজ্ঞাসহকারে পরিচালিত যাবতীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য প্রতিপালিত হবে।"

উপরোক্ত প্রতিটি মন্তব্যেই একটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষাকে বুদ্ধিবৃত্তিসুলভ প্রবণতা, নৈতিক মান, মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং সামাজিক, নৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক আওতার মধ্যেই তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থাৎ, এতে বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে।

'গণতন্ত্র এবং শিক্ষা' নামধেয় গ্রন্থে ডিউই এই সিদ্ধান্তেই [illegible] হয়েছেন। তিনি বৃত্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ [illegible] এই বলে যে, কাজটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাহ্যিক [illegible] দ্রব্যের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।”[১৬] [illegible] সম্পর্কে অবহিত হওয়া বলতে এখানে কাজটির ব্যাপকত্ব ও [illegible] ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে নিশ্চয়ই।

এ সবই অত্যন্ত সহজে বোঝা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, ডিউই [illegible] বলেছেন যে, পাঠ্যসূচীকে “ছাত্রের তৎকালীন প্রয়োজনীয়তা ও [illegible] উপর নির্ভর করে প্রণীত করতে হবে।” তিনি বলেছেন, “[illegible] এইভাবেই শিক্ষাদাতার ও শিক্ষার্জনকারীর পক্ষে নিজ নিজ শিক্ষা-পটুতা বিষয়ে সম্যক ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এটা [illegible] হলেই ভবিষ্যৎ জীবনে ছাত্রটি কোন্ বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জনে [illegible] হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এই পর্যায়েই প্রশিক্ষণের [illegible] দেয় এবং ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক এবং জনগণের কাছে এর [illegible] চাহিদা তার গুণেই এটির ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠবে।

অথচ, স্বয়ং ডিউই-ই, সুদূর ১৮৯৭ সালে 'মাই পেডাগগিক [illegible]' পুস্তকে এই ধরনের প্রশিক্ষণের অনুপযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। 'গণতন্ত্র এবং শিক্ষা' গ্রন্থ প্রণয়নের আগে লিখিত এই [illegible] তিনি বলেন : “যে কোনো ছাত্রকে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার [illegible] উপযোগী করে গড়ে তোলার একটিই মাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে তার সমূহ গুণাবলীর বিকাশসাধনের উপযোগী প্রতিবেশ সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের ফলে আজ থেকে কুড়ি বছর পর সভ্যতার চেহারা কিরূপ ধারণ করবে তা সঠিকভাবে বলা খুবই কঠিন। এ কারণেই কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট একটি পরিস্থিতির উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।”[১৭]

আজ থেকে কুড়ি বছর পর সভ্যতার চেহারা কেমন হবে [illegible] সম্ভব নয়। এর চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার হচ্ছে—[illegible] কোনো মাত্রাই থেকে থাকে—এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার [illegible]

চাকুরিগত পরিস্থিতি কিরূপ ধারণ করবে তা নির্ণয় করা। এমনকি তখন লাভজনক চাকুরি বলতে আদৌ কিছু থাকবে কিনা সেটাও [illegible] [illegible] বিষয়। এ কারণেই [illegible] [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] করবে তা নির্ধারণ [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] মার্ক্স এবং এঙ্গেলস এবং আমেরিকার জন ডিউই-এর অনুগামীদের [illegible] যা কিছু ঘটেছে তার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু [illegible]। [illegible] বৈচিত্র্য সাধনার পথ ত্যাগ করে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে [illegible] বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে আরম্ভ করে। মার্কিনরা [illegible] [illegible] শিক্ষা না দিয়ে বৃত্তির জন্য উপযোগী করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। এর কারণ কলেজে শ্রম বাজারের চাহিদা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়নি এবং মার্কিনরা, সাধারণভাবে শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ভেদরেখা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অথচ মার্ক্স এবং ডিউই উভয়েরই প্রস্তাবে মহত্তর উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছিল। মার্ক্স বৈচিত্র্যের সাধনা বলতে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও শিল্পনির্ভর সমাজের তাৎপর্য অনুধাবন করার কথা বলেছিলেন। ডিউই-ও এই একই উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদানের সময় মানসিক, নৈতিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি চর্চার কথা বলেছিলেন। এরা দু'জনেই প্রত্যেকের জন্য উদার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। এদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে মুক্তমনা করে গড়ে তোলা এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলাও বটে।

প্রশ্নটিকে এইভাবে উপস্থাপন করা যায়, সে যে যুগে বসবাস করছে সে যুগের সম্বন্ধে তার পরিচয় না ঘটলেও কি আধুনিক মানুষের মনকে মুক্ত করা যায়? আধুনিক মানুষ যদি যান্ত্রিক কলাকৌশলের তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারে, তাহলেও কি যান্ত্রিক কলাকৌশল নিজেদের [illegible] [illegible] হবে? এর উত্তর যদি না-সূচক হয় তাহলে [illegible] [illegible] এই তাৎপর্য অনুধাবন কিভাবে সম্ভব? আধুনিক যুগোপযোগী [illegible] শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়?

অচিরস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী

অ্যালফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন: অসাধারণের মধ্যে সাধারণ এবং ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে চিরস্থায়ীর অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্য বিদ্যার্জনের জন্য বিদ্যাচর্চার মধ্যেই মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির মূলনিহিত আছে...লর্ড বেকনস্‌ফিল্ড তার একটা উপন্যাসে যে ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করে তাকেই বাস্তবানুগ চিন্তার অধিকারী মানুষ বলে সনাক্ত করেছেন। রোমকরা যে একটি মহান জাতি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু ওই জাতি বাস্তবানুগ চিন্তার দাসত্ব করার দরুন যে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় তার দ্বারা অভিশপ্ত ছিল।[৮]

বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এই একই কথা বলেছেন:

প্রায়শঃই বলা হয় যে চরম সত্য বলে কিছু নেই। আছে শুধু মতামত এবং ব্যক্তিগত বাছ-বিচার। বলা হয়, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রবণতা, বিশ্বদর্শন, রুচি-অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকি। বলা হয় সত্যের এমন আলাদা কোনো রাজত্ব নাই যেখানে সহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের গুণে আমরা প্রবেশলাভ করতে পারি। আছে শুধু আমার সত্য বা তোমার সত্য অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সত্য। এই ধরনের মানসিকতা মানুষের অন্যতম একটি প্রবৃত্তিকে এবং তার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দেয়। এর ফলে আমাদের নৈতিক জগৎ থেকে অপক্ষপাতিতা নামীয় দুর্লভ গুণটির অপসারণ ঘটে। এই ধরনের সংশয়বাদের মূলোৎপাটনে গণিতশাস্ত্র কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কেননা, এর সত্যগুলি যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ ও সমালোচনার মুখেও অক্ষত এবং অনড়ভাবে টিকে আছে। যে কোনো মহৎ বিষয়ে চর্চা অব্যাহত রাখার সুফল ওই বিষয়ের মধ্যেই যে নিহিত থাকে তাই নয়, এর ফলে মানসচর্চার ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ সাধিত হয়। গণিতশাস্ত্র চর্চার সময় এই কথাটি মনে রাখতেই হবে।

আজকে ত মর্থ হোয়াইটহেড এবং লর্ড রাসেল এই দাবী করবেন না যে, অসাধারণের মধ্যে সাধারণ এবং ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে চিরস্থায়ীর অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্য। অথবা গণিতশাস্ত্রই যাবতীয় সংশয়বাদের একমাত্র নিদান। অথবা শুধু গণিতচর্চার মাধ্যমেই মানসিক উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব। রাসেল, বস্তুত, 'প্রতিটি মহৎ বিষয়ে চর্চার' কথাই বলেছেন। এরা দু'জনেই গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, জ্ঞানের সাধনা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জন্যই বাঞ্ছনীয়। এই লক্ষ্য শুধু বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক দর্শনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারারও এটিই মূল কথা। আনন্দবিধান বা কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন যে কোনো শিল্পচিন্তারও এটিই মূল বক্তব্য। এগুলিই মানসচর্চার মূল উদ্দেশ্য ; এগুলিই যাবতীয় মানসচর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র

বিশ্ব যে শিক্ষা অর্জনের প্রয়াসী সে শিক্ষা অর্জন করতে হলে যে বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে হোয়াইটহেড এবং রাসেলের এই উক্তিতে কোনো ভুল নেই। ১৯৬০-এর দশকে সি. পি. স্নো 'দুই সংস্কৃতির' বিভাজন এড়াবার জন্য যে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন এটা শুধু সে কারণেই প্রয়োজনীয় নয়। মানসিক জগতে একতার সঞ্চার করতে হলে, অথবা যে কোনো বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠানে এটা আরোপ করতে হলে—সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যকে ওই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শাখার মূল সূত্রগুলি অনুধাবন করতে হবে। স্নো-ও এই বিষয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র কারিগরী বিদ্যার মূলাধার। শুধু এ কারণেই এই বিষয়গুলিতে প্রতিটি নাগরিকের মনোনিবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এছাড়া, এগুলির হোয়াইটাহেড এবং রাসেল কথিত গুণবত্তা তো আছেই। গণিতশাস্ত্রের অতিরিক্ত আরও একটি দাবী আছে: বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কৌশল। অনেক বিষয়ে চিন্তা করতে হলেই গাণিতিকের মত চিন্তা করতে হয়।

হারবার্ট স্পেনসার, আমাদের স্বীকার করতেই হবে, অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন মূল প্রশ্নটি হচ্ছে: "কিভাবে পূর্ণভাবে জীবনযাপন করা যায়?" এবং এটাই যেহেতু আমাদের জানা সবচাইতে প্রয়োজনীয় সেই হেতু এটাই শিক্ষাব্যবস্থার মূল শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত।১

স্পেনসার মানুষের জীবনের প্রধান কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তার মতে এগুলিই মানুষের জীবনের প্রধান বিষয় এবং একারণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষকে এগুলি শিক্ষা দিতে হবে। স্পেনসার পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আত্মরক্ষা, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ, সন্তানদের গড়ে তোলা ও তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ করে তোলা, যথাযথ রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অবসরযাপন অর্থাৎ রুচি ও অনুভবের তুষ্টি সাধন।

এক নজরে এই তালিকা স্কুলের পক্ষে অনাবশ্যক বোঝাস্বরূপ বলে মনে হয়। এর ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর শিশুকে বয়স্ক মানুষে পরিণত করে তোলার দায়িত্ব বর্তায়। এতে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবকে অস্বীকার করা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে সবকটির ভার-দায়িত্ব কাঁধে তুলে দিতে বলা হয়। কিন্তু স্পেনসার, আধুনিক মতাদর্শের অনুসারীদের মত, আত্মরক্ষা বলতে জীবিকার্জন, পরিবার পালন বা অনুরূপ বিষয়ে শিক্ষার্জনের কথা বলেননি। তিনি এইসকল কর্মকাণ্ডের অন্তরে যে মূলনীতিগুলি রয়েছে সেগুলিই স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।

উদাহরণতঃ বলা যায়, তিনি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য পাঠগ্রহণের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, ব্যবসা হচ্ছে বিজ্ঞাননির্ভর। সুতরাং, প্রত্যেককেই বিজ্ঞান শিক্ষা করতে হবে।

আপত্তিটা বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। তা হতেই পারে না। এটা যে প্রতিটি আধুনিক মানুষের শিক্ষাচর্চার অঙ্গ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত সে কথা তো আমরা আগেও বলেছি। সমস্যাকে মূল্যায়ন

শিক্ষণীয় বিষয় কি ? স্পেন্সার এর উত্তরে যা বলেছেন আপাততঃ তারই বিরুদ্ধে। তার উত্তরে এটাই প্রকটিত হয়ে উঠছে যে, বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোনো শিক্ষারই কোনো দাম নাই।

স্পেন্সার যে সময় এই কথাগুলি লিখেছিলেন তখন ব্রিটেনের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানচর্চার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। তর্কের খাতিরে তিনি বাড়াবাড়ি করেছিলেন হয়ত বা। কিন্তু এর পিছনে আরও একটি গভীর কারণ প্রচ্ছন্ন ছিল বলে মনে হয়। সেটি হচ্ছে সময়ের গুণ। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার ঘোষিত হচ্ছিল চতুর্দিকে, তখন তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন। তখন, আজ থেকে প্রায় শতাধিক কাল পূর্বে, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মত চোখ প্রত্যক্ষদর্শী কোন উৎসাহীর ছিল না। বিজ্ঞান সকল প্রশ্নের সমাধানে সক্ষম এই চিন্তা তখন মানুষের মনে স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্রয় পেয়েছিল। অন্য কোনো বিষয়ে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান তখন অবাস্তব বলেই বিবেচিত হতো।

দুর্ভাগ্যক্রমতঃ, এমন অনেক সমস্যাও আছে বিজ্ঞান যার সমাধান করতে অক্ষম। বিজ্ঞানী পারমাণবিক বোমা তৈরীর উপায় বাতলে দিতে পারেন। কিন্তু এটি কোন্ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করা হবে তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে না। বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু শুধু বিজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞান এবং কারিগরি কৌশল আমাদেরকে মানবজাতিকে ধ্বংস করার পন্থা নির্দেশ করে দিতে পারে ; কিন্তু মানবজাতির ধ্বংসসাধন আকাংখিত কিনা সেটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের আওতাভুক্ত হতে পারে না।

কারিগরী বিদ্যা

এই পরিচ্ছেদে সকলের জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে : কোন্ মূল স্তরসমূহ প্রতিটি মানুষের পার হয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিটি তরুণকে বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক বিশেষজ্ঞ অথবা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে পারে না।

বরং এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেককে বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর মৌল দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করা।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বহুশিল্পবিদ্যা চর্চার ধারা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত তথ্য আহরণ করেছি তাতে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু লক্ষ্য করা যায়নি। স্কুলে বিশেষ কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের ফল ক্ষতিকর বলেই এতে প্রমাণিত হয়েছে। এটাকে কারিগরী বিদ্যার পরীক্ষামূলক গবেষণা বলে আখ্যায়িত করা হলেও এই ট্রেনিং বস্তুতঃ চাকুরীর জন্য ট্রেনিং-এ পর্যবসিত হয় এবং কারিগরী বিদ্যার যুগে এই ধরনের ট্রেনিং যত প্রকার বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারে এগুলিকেও তার সম্মুখীন হতে হয়।

এই অনুসন্ধানের ফলে আমরা মূল ভাবধারাগুলির পুনরালোচনামূলক পাঠ্যসূচীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ছি। এই ভাবধারাগুলির অসাধারণের চেয়ে সাধারণ এবং চিরস্থায়ীর চেয়ে ক্ষণস্থায়ীর সঙ্গে বেশী সংযোগ রয়েছে। কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে, মূল ভাবধারাগুলি, বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের সন্তান বলা যায়। সমাজ বিজ্ঞানে আইনসমূহের যে ভূমিকা, শারীরবিদ্যায় ঔষুধের যে ভূমিকা, বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কারিগরি বিদ্যারও সেই একই ভূমিকা রয়েছে। সমাজ সমীক্ষায় আইন সম্পর্কীত বিষয়ের উপস্থাপনা যেমন এড়ান সম্ভব নয় এবং উচিতও নয় তেমনি পদার্থ বিদ্যা সম্পর্কে পার্যালোচনার সময় কারিগরী বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সেটা উচিতও নয়। উদারনৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কার্যক্ষম কারিগর উৎপাদন করা নয়, এর উদ্দেশ্য হলো নারী ও পুরুষকে বোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

এমনকি উদ্দেশ্যটা যখন কারিগর উৎপাদনও হয়, টমাস হাক্সলী যাঁদের বলেছেন 'হস্তশিল্পবিদ্যাবিশারদ' তাঁদের বেলাতেও শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। তিনি বলেছেন:

জানি আপনারা বলবেন ডেনমার্কের যুবরাজ ছাড়াই 'হ্যামলেট' নাটক মঞ্চস্থ করার মত ব্যাপার এটা। বলবেন, আপনার কারিগরী

বিদ্যা' তো সুশিক্ষারই নামান্তর। আপনার কথিত ওই শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ তো শারীরবিদ্যা, অঙ্কনবিদ্যা এবং চলতি ভাষা ছাড়া আরও একটি আধুনিক বিষয়ে শিক্ষালাভ। এর মধ্যে আলাদা কোনো কারিগরী কৌশলের ব্যাপার তো নেই। ঠিক বলেছেন। আপনাদের এই মন্তব্যই আমাদেরকে আমার বক্তব্যের মূল কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমার বিচারে, হস্তশিল্পবিদ্যাবিশারদকে তার প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়ে চলতি কথায় যাকে 'কারিগরী' বলা হয় সে সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেওয়াই উচিত হবে না। কারখানাই হচ্ছে হস্তশিল্প শিক্ষা প্রদানের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।[১০]

সমাজকে বোঝার উপায়

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বক্তব্যানুসারে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, নৃতত্ত্ব এবং নীতিশাস্ত্র "মহৎ বিষয়সমূহের" অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এগুলির সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এই বিষয়সমূহের গণিতশাস্ত্রের 'নিশ্চয়তা' নেই। বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যার ফলে যে ধরনের স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব এই বিষয়গুলির পুনরালোচনায় অথবা এই বিষয়গুলির আলোকে বিচার্য বিষয়সমূহে সেরূপ কোনো 'সিদ্ধান্তে' উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। শোপেনহাওর, বলেছিলেন পনেরো বছরের কম বয়স্ক বালকদের এমন বিষয়ে শিক্ষাদান করা উচিত নয় যে বিষয়ে মারাত্মক ভুল ঘটার সম্ভাবনা আছে। তিনি সম্ভবতঃ এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই এই উক্তি করেছিলেন। শোপেনহাওর পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পনেরো বছরের কম বয়স্ক কোনো ছাত্রকে যেন অঙ্কশাস্ত্র, সাধারণ বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করার শিক্ষায় নিয়োজিত না করা হয়। যে সমস্ত বিষয়সমূহের সঙ্গে সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে সেই বিষয়গুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা উচিত যেন সেগুলি সম্পর্কে জীবনব্যাপী আলোচনা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়।

এই প্রসঙ্গে ওক্‌সট সাহেব যে মন্তব্য করেছেন তাতে সমস্যাটির পূর্ণ চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে ঃ

মানুষ হিসাবে আমরা পৃথিবী বা নিজেদের সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধানের উত্তরাধিকারী নই, সংগৃহীত কোনো তথ্যপুঞ্জেরও আমরা উত্তরাধিকারী নই। আমরা একটি আলাপ-আলোচনার উত্তরাধিকারী। এই আলোচনার শুরু হয়েছিল আদিম অরণ্যে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থেকেছে এবং অধিক থেকে অধিকতর গঠনমূলক রূপ নিয়েছে। এই আলাপ-আলোচনা অন্তরকে অনুভূত হয়, আমরা নিজেদের সঙ্গে নিজেরাও এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হই আমরা। এতে যে তর্ক, অনুসন্ধান এবং তথ্যের কোনো ভূমিকা নেই তা নয়। এগুলি যেখানেই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় সেখানেই এগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়। এগুলি অবশ্য আলোচ্য সূচীতে খুব একটা আকর্ষণীয় স্থান অধিকার করে থাকে না…আলাপ-আলোচনা কোনো বাহ্যিক ফললাভের প্রতিশ্রুতি দেয় না, এতে যে জয়লাভ করে সে কোনো পুরস্কারও পায় না। এটাকে সমালোচনা অথবা ব্যাখ্যা হিসাবেও পেশ করা যায় না। এটা একটি মানসিক অভিযান। এই অভিযানের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নাই। শিক্ষা. সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই আলাপ-আলোচনার অংশগ্রহণের উপযোগী দক্ষতা অর্জনেরই নামান্তর। এই শিক্ষার গুণে আমরা কণ্ঠস্বর সনাক্ত করতে ও মতামত প্রকাশে সময় ও সুযোগ বুঝে নিতে পারি। শিক্ষা আমাদেরকে এই আলোচনার অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও নৈতিক অভ্যাসসমূহ রপ্ত করার সুযোগ দেয়। এই আলাপ-আলোচনাই পরিশেষে, মানুষের প্রতিটি কাজ ও বক্তব্যকে নির্দিষ্ট একটি চারিত্র্য অর্পণ করে।[১১]

জ্ঞানের প্রকারভেদ

বিভিন্ন বিষয়ে কতদূর নিশ্চয়তা অর্জন সম্ভব অ্যারিস্টটল এথিক্স-এ তৎসম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তার কতগুলিতে এই বিষয়গুলি কোন্ বয়সে চর্চা করা উচিত সে বিষয়েও মন্তব্য করেছেন। নৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের কোনো আলোচনা তরুণদের জন্যে

[illegible] উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। তিনি বলেছিলেন: "তরুণদের এই আলোচনায় [illegible] উচিত নয়; তার কারণ, জীবনের বর্তমান ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং এই আলোচনাসমূহ [illegible] থেকেই উদ্ভূত এবং এগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।" অ্যারিস্টটলের আমলেও, তরুণেরা, তিনি যতটা মনে করতেন তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল হয়ত বা। কিন্তু এটা স্বতঃপ্রমাণিত যে, যে সমস্ত বিষয় বুঝতে হলে সাবালকত্বের প্রয়োজন, সে সব বিষয় নাবালকদের শেখানো যায় না। সংলাপে অংশগ্রহণ করা এক কথা, আর সেগুলোর অনুসরণে সাহায্যশীল নিয়মানুবর্তীতার পদ্ধতিগত শিক্ষালাভ [illegible] কথা।

দর্শনকলার মহৎ সৃষ্টিগুলি সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। শিল্পকলা উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এগুলি যে শুধু শিক্ষণেই মূল্যবান তা নয়। এগুলি বিশ্বকে বোঝার অন্যতম উল্লেখযোগ্য মাধ্যমও বটে। শিল্প ও সাহিত্যের মহৎ সৃষ্টিগুলির সম্পূর্ণ তাৎপর্য অপরিণত বোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাটা এত লোভনীয় হওয়ার কারণ এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সকলকে সর্ববিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার জন্য স্কুলে যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে না। অতীতের শিক্ষাব্যবস্থায় [illegible] ষোলো বছর বয়সে যে বালক শেকস্পীয়রের রচনাবলী পাঠ করত সে সারাজীবনে আর কখনও ওই রচনাবলীর ধারে-কাছে যেত না। এতে শেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য সাধিত হতো বলা যায় না। ছেলেটি শেক্সপীয়রের রচনাবলী পাঠ করেছে, কিন্তু তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি।

[illegible] বাধা

[illegible] শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থাৎ যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] তার সত্তার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সমাজে প্রয়োগ করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল অথবা সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান স্কুলগামী ছাত্রদের অপুষ্ট বুদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। কেননা, অন্ত দেশের জনগণের অবোধ্য আচার-আচরণ দৃষ্টে সে নিজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ ভাষা চর্চার উপমাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে কোনো ছেলের কাছে মাতৃভাষা তাকে ঘিরে থাকা বাতাসের মতই স্বাভাবিক। ভাষা কি তা বোঝার কোনো প্রয়োজন তার নাই। ভাষা কি তা জানতে হলে তাকে অপর একটি ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। এই অপর ভাষাটি তার মাতৃভাষা থেকে যত বেশী আলাদা হয় ততই ভালো। অন্য যে কোনো কারণে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার ব্যাপার-টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ দেশেও কোনো ছাত্রকে শুধু সামাজিক সম্পর্ককে আরও ব্যাপক করার জন্য বিদেশী ভাষা রপ্ত করার কথা বলা সম্ভব নয়। কেননা, ওই ছাত্রটির পক্ষে সারাজীবনে হয়ত এমন কোনো ব্যক্তির দর্শনলাভও সম্ভব নয় যে বিদেশী কোনো ভাষায় কথা বলে। সু-অনুবাদিত গ্রন্থের কোনো অভাব নাই। সুতরাং, অন্য ভাষায় বই পড়ার জন্য বিদেশী ভাষা রপ্ত করার প্রস্তাবটিও এক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না।

ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষা রপ্ত করার সপক্ষে ওই ভাষার পৃষ্ঠপোষকেরা যে সমস্ত যুক্তি দেখান সেগুলির কোনোটিই বাস্তবসম্মত ছিল না। এই ভাষা দু'টি শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে তারা যখন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, এর ফলে ইংরেজী শব্দের গ্রীক অথবা ল্যাটিন অপভ্রংশের সন্ধানলাভ ত্বরান্বিত হবে তখনই তারা ভুল করেছিলেন। এই যুক্তি প্রদর্শনের ফলেই তাদের বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পায়। প্রাপ্তব্য ফললাভের তুলনায় ব্যাপারটা যৎপরোনাস্তি আয়াসসাধ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন দুই বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষাদানের কর্মসূচীটি চালু রয়েছে। এই শিক্ষাসূচী অনুসারে

ছাত্রদেরকে এই দুই সভ্যতার ভাষা, ইতিহাস এবং দর্শন সম্পর্কে গভীর-ভাবে পড়াশোনা করতে হয়। এতে ভাষার কাঠামো ছাড়াও ছাত্ররা নিজেদের সংস্কৃতি বিচারের একটি নিরিখ পায়। এই কর্মসূচীর প্রবক্তারা এই যুক্তিটি দেখাতে পারেন বটে। সচরাচর যে লক্ষ্য সাধনের জন্য সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জনারও এই যুক্তি দেখিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে সবচেয়ে আগে তার পরিচিত ঘর-বাড়ী, রাস্তা এবং প্রতিবেশী সম্পর্কে অবহিত করতে হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। জনার বলেন, এই কর্মসূচীর একটি ত্রুটি আছে। সেটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের পক্ষে নিজের পরিচিত প্রতিবেশ থেকে সাধারণীকরণে উপনীত হওয়ার জটিলতা অনুধাবন না করতে পারা। ধরা যাক, আপনি কয়েকজন শিশুকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) শাসনব্যবস্থার কাঠামো বোঝাতে চাইছেন; তখন, জনারের মতানুযায়ী আপনি জানতে পারলেন যে, 'বন্ধুভাবাপন্ন পিয়নটি' আসলে ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে এটা বোঝাতে হলে সরকার কি, ফেডারেল সরকারই বা কি, শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এবং ইচ্ছানুযায়ী চাপিয়ে দেওয়া ক্ষমতার পার্থক্য কোথায় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[২]

আমি এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, অদ্যতন উদার শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রীক, ল্যাটিন অথবা প্রাচীন সভ্যতার চর্চার পক্ষে আমি ওকালতি করতে চাই না। আমি এ কথাও বলছি না যে, মার্কিন শিশুর ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে নাইজিরিয়ার ফেডারেল সরকারের কাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে, কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের সমাজ সম্পর্কে অবহিত হতে হলে তাকে কিছুটা নিরপেক্ষ দূরত্ব বজায় রাখতেই হবে। নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্য যেমন অপর ভাষা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। এই নিরপেক্ষ দূরত্ব অর্জনের অসংখ্য উপায় আছে। আসল কথা হলো উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা

এই পরিচ্ছেদে যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তা ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটেই করা হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও যদি শিক্ষিত বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মত থাকবে, বলা অনুচিত হবে এই পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের পক্ষে সুপারিশ করা অর্থহীন হতো। অগ্রসর জাতির লোকেরা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ভাষা, ইতিহাস এবং চারুকলা বিষয়ে পড়াশোনা করছে—ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা। ওরা পড়াশোনা এবং লেখার কাজে ব্যস্ত রয়েছে—ভেবে দেখুন একবার এটা। ওরা যে আদৌ পড়াশোনা করছে এটাও ভাববার বিষয় নয় কি?

এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে কিনা সেটা এই সিরিজের অন্যান্য প্রবন্ধ এবং বক্ষ্যমান নিবন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলির উন্নীতকরণের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত উন্নয়নের মধ্যে বিজ্ঞান এবং কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে আরও প্রয়োজন পশ্চিমা ভাবধারাগুলির সম্প্রসারণ। সার্বজনিক লক্ষ্য ও বোধের উন্মেষ ঘটলেই সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার সুনিশ্চিত হবে। এর ফলে উদারনৈতিক শিক্ষার মূল প্রবণতাগুলির অনুসরণ সহজসাধ্য হবে এবং মানুষের সাবিক মুক্তিসাধনে কার্যকরী শিক্ষাব্যবস্থারও প্রসার ঘটবে।

১৯৬০-এর দশকে ১০০০ বছর ধরে লালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ একেবারে লোপ পেয়েছে বলে মনে হয়। পুরোন আদর্শের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে নতুন এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বিস্তারলাভ করেছে। এই নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদল হবে রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থার অনুরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীদের একটি স্বশাসিত সমাজ হিসাবে না ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অধুনা জ্ঞানশিল্পের মূল কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শক্তি, সমৃদ্ধি ও সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। আমেরিকার সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেছেন: "নতুন জ্ঞানই যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল কথা এই বহুলপ্রচলিত অভিব্যক্তিটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সবচেয়ে বড় বাস্তব সত্য বলে সপ্রমাণিত হয়েছে।"

বিশ্ববিদ্যালয় কি সমাজের সেবক অথবা সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে? এই সংস্থাটিকে কি কারও উপর নির্ভরশীল হতে হবে অথবা এটি স্বাধীন একটি সংস্থাই থাকবে? এটি কি আয়নার কাজ করবে অথবা বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির? জাতির তাৎক্ষণিক ও বাস্তবানুগ প্রয়োজন মিটাবার কাজে এটাকে ব্যবহার করা হবে অথবা মহান সংস্কৃতিসমূহের বিকাশ ও তার তাৎপর্য নির্ধারণেই এটাকে নিয়োজিত করা হবে? বিশেষজ্ঞ অর্জনের এই যুগে কি মানসচর্চায় নিয়োজিত একটি সমাজের উদ্ভব সম্ভব? রাষ্ট্রীয় আয়ত্তাধীন কোনো শিল্প কি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হওয়ার ভান করতে পারে? অথবা আপাত বিরোধী এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে কি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে?

শিল্প-বিপ্লব এবং জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই এই জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেউ না কেউ কোনো না

কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহারের চেষ্টা করছে। নেপোলিয়ন, উদাহরণতঃ বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একধরনের অস্ত্রসজ্জিত পাহারাদার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ

আমার আশা যদি ফলবতী হয় তাহলে আমি এই বাহিনীকে সামাজিক হিতের জন্য ক্ষতিকর তত্ত্ব প্রচারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে সমর্থ হবো।...এই সংস্থাগুলি, রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ ও নৈতিকতার প্রথম রক্ষাকারী হিসাবে, শুরুতেই বিপদসংকেত ঘোষণা করতে পারবে। যারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিপজ্জনক তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করবে এরা তাদেরকে প্রতিহত করবে। এরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১]

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মূল চীন-ভূখণ্ডে এই একই আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটেছে লক্ষ্য করা যায়। তবে এ দু'টি দেশে শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রয়োজনমাফিক কিছু নতুন ভাবধারারও সংযোগ ঘটান হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিল্পায়ন দ্রুত করার নিমিত্ত কর্মসূচী প্রণয়ন ও কর্মী তৈরীর কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ১৮৬২ সালের মোরিল বিধান অনুসারে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা চালান হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এতে সাড়া না দেওয়ায় সরকার নতুন এক ধরনের বেশ কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এগুলি সরকারের উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কাজ ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে 'সুফলদায়ক' এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জানাজানি হয়ে যায়। বিশেষতঃ কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য এর যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এই ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত হতে হবে এই চিৎকারটা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। কারিগরি জ্ঞানের প্রসার বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এটা বিশ্বময় স্বীকৃতি লাভের পরপরই শিক্ষা প্রদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। উন্নয়নশীল

দেশগুলিতে এই মতের প্রবক্তাদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ সেইসব দেশে যে সব দেশ মাত্র কিছুকাল জাতীয়তা অর্জন করেছে। এর কারণ এদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশীর ভাগই ছিল নতুন এবং এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো না কোনো উদ্দেশ্যকে প্রকটিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৫০,০০০ ছাত্রবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে এখানে ৩,০০,০০০ ছাত্রের আগমন ঘটবে বলে আশা করে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রের হার এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া একপক্ষে বিরক্তিজনক বটে। এর ফলে অবশ্য এর উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীতে তেমন কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নি। প্রয়োজন ঘটলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর অধীনে অসংখ্য ছোটো ছোটো কলেজ আছে—যাঁরা এই ব্যবস্থার অনুকরণ করতে চান তাঁরা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করতে পারেন। সংখ্যার চেয়ে ছাত্রের গুণাগুণ ও তাদের প্রস্তুতির ধরনটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সেকেণ্ডারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং এর উদ্দেশ্যমূলক চারিত্র্য বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন সব দাবী পূরণে বাধ্য করেছে যে সব দাবীর মুখোমুখি আর কখনও তাকে হতে হয়নি। এই দাবী পূরণের জন্য প্রয়োজন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তার চারিত্র্য পরিবর্তন করতে বলা হয়।

বহু দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। শুধু খেলাধুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারনৈতিক শিক্ষার ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়, কেউ কেউ এমন কথা বলেন ; অর্থাৎ, খেলার জন্যই খেলা হয়। কিন্তু কোনো কোনো দেশে এটাও সত্য নয়। প্রচার এবং দর্শকদের কাছ থেকে আদায়কৃত দর্শনী অনেক সময় খেলাধুলার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জ্ঞানচর্চার খাতিরেই জ্ঞানচর্চা, এই কথাটি বারংবার উচ্চারিত হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এর প্রভাব দিন দিন হ্রাসই পাচ্ছে বলা উচিত।[২]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় [illegible] সরকার সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবেষণার জন্য [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এই সরকারের একটি উদ্দেশ্য আছে। সরকার এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্য কামনা করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের [illegible] প্রস্তুত, এই টাকা গ্রহণ করে সেই বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের এই উদ্দেশ্যেরও বাহক হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যের আওতায় পড়ে না। সরকারের এই অর্থ বরাদ্দ লাভ করার জন্য বিশেষ এক ধরনের উপাধি এবং এ পর্যন্ত অজ্ঞাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অর্জনের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত অধ্যাপকদের কাজে লাগান হয়। তখন, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এই সরকারী ব্যবস্থাপনাই, অধ্যাপকের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাপকের, স্থিতি, এমনকি স্থানিক অবস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করছেন। তিনি যেখানে তার পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে মনে করবেন সেখান থেকেই তার এই রসদ সংগ্রহ করবেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বহু কর্মীবিশিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তখন তিনি বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা এবং আলোচনা করেই সময় অতিবাহিত করতে পারেন। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, নামে মাত্র একটা প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তিনি কোনো আগ্রহও দেখাবেন না। অধ্যাপকটি কোনো একটি বুদ্ধিজীবী সমাজের অংশভাক হতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের সমাজের কোনো নাম থাকে না, স্থানীয় কোনো আবাসও নয়। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বলতে যা বোঝাত এটা সে রকম কিছু নয়।

বিশ্বব্যাপী একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ধারণার মধ্যে [illegible] আছে। ব্যাপারটা আকর্ষণীয়ও বটে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী [illegible] অধ্যাপকেরা যত্রতত্র যেতে পারবেন। তারা নিজেদের [illegible]

সুবিধা মতো করবেন সেখানেই মিলিত হতে এবং পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পারবেন। আলোচ্য বিষয়ের উপরই তাদের আকর্ষণ থাকবে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরে নয়। এভাবে দেশে দেশে 'দেয়াল হীন' এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আর্থিক সমৃদ্ধি এবং কারিগরি জ্ঞানের প্রসারের ফলে পণ্ডিতদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারটি সহজতর হয়ে পড়েছে। যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ যে কোনো জায়গা থেকে গবেষণায় সাহায্যকারী বস্তু ও সহকারী সংগ্রহ করতে পারেন। সারা দুনিয়ার বিষয়সম্পদ এখন তার আয়ত্তে। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কোন ধারণা এই সম্ভাবনাগুলিকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে এই সুযোগ-সুবিধাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন আদর্শে বিন্যস্ত করা সম্ভব কি-না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই আদর্শের ভিত্তি একটি সার্বজনীন সিদ্ধান্তকে প্রকটিত করে। ওই আদর্শভিত্তিক সিদ্ধান্তটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান, জীবন ও বিশ্ব-অপিচ সত্যকে এক করে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের ভণিতা ও বাড়াবাড়িকে সংযত করা। তাদেরকে শিক্ষায়তনিক চক্রের মধ্যে টেনে আনা এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমালোচনার সম্মুখীন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি বিষয়কে অন্য বিষয়ের আলোকে দেখতে হয়। শুধু সামাজিকতার মুখ চেয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একতা রক্ষার জন্য এটা করা হয় না। বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের সুবিধার্থেই এটা করা হয়। কেননা, অন্য বিষয়ের আলোকে পর্যালোচনা না করলে বিশেষজ্ঞরা এবং গবেষকরা তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে পারবেন না।

জীববিজ্ঞানী এমিল দু বোইস-রেমণ্ড বহুকাল আগেই এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বেকন এবং লকের মতবাদ অনুসরণ করে তিনি বলেন:

একান্তভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাধনা অন্য যে কোনো একটি বিষয়ে একনিষ্ঠ সাধনার মতই চিন্তার ক্ষেত্রকে সীমায়িত করে দেয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আমরা চোখে যা দেখি, বা হাত দিয়ে যা করি কিংবা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনায় যা সন্দেহাতীত ভাবে ধরা দেয় তাকেই চরম সত্য বলে বিবেচনা করে। এক দিক দিয়ে বিচার করলে এই গুণটিকে অত্যন্ত সুবিধাজনক বলেই আখ্যায়িত করা যায়। প্রকৃতিক বিজ্ঞান যেখানে স্বরাজ্যে স্বরাট সেখানে মানুষের কল্পনা স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না এবং মানুষের আত্মাও আর তত সজাগ-সচেতন থাকে না। এর ফলে মানুষের মন সংকীর্ণ এবং বিশুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে।[৩]

বিশ্ববিদ্যালয় মানুষের ন্যায়পরতার প্রতীক, সভ্যতার বিশ্বস্ত রক্ষক; একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিসাবে অভিহিত করেন তারা শব্দমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে তা করেন না। এই সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সেটি হচ্ছে সমবেত-ভাবে চিন্তা করা। যাতে প্রত্যেকে এককভাবে চিন্তা করে যে ফললাভ করে তার চেয়ে বেশী ফললাভে সক্ষম হয় সে ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকে এককভাবে চিন্তা করলে নিজস্ব খেয়াল-খুশি প্রাধান্য লাভ করে এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট চিন্তাবিদ নিজের বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন।

লাগোস-এর কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি টোকিও, কায়রো, রোম এবং নিউইয়র্ক থেকে আগত তার সহ-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন এবং বছরে অর্ধ ডজন সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন এই দৃশ্য খুবই মনোরঞ্জক হতে পারে। কিন্তু ভাবাদর্শের কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে ভূমিকা রয়েছে এটাকে তার বিকল্প হিসাবে পেশ করা যেতে পারে না। এই ভাবাদর্শের কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত সদস্যেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সহ-গবেষকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিলিত হতে পারেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রাণধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও করা সম্ভব। ওই বিশেষজ্ঞদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখতেই হবে যাতে এটা ভাবাদর্শের কেন্দ্র হিসাবে বহাল থাকতে পারে।

এই ধরনের একটি কেন্দ্র বিশেষত্ব অর্জন অথবা পেশাদারী শিক্ষা অর্জনের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। অবশ্য কোন্ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং বিশেষত্ব অর্জন কতদূর গ্রাহ্যণীয় তা নির্ধারণ করে দেবে এই কেন্দ্র। উদ্দেশ্যটা যদি মোটামুটিভাবে সফলকাম আইনবিদ, চিকিৎসক, প্রশাসক, ইঞ্জিনিয়ার এবং কারিগর ট্রেনিং দেয়াই হয় তাহলে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজন নাই। এই বৃত্তিগুলি যে সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা এবং সংস্থার শিখান যেতে পারে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। চার্ল জ্যাসপার ইউরোপের জন্য নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি শাখা খোলার কথা বলেছিলেন। আরও উন্নত কারিগর তৈরীর জন্য তিনি এই প্রস্তাব দেননি। তিনি এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন কারিগরি বিদ্যাকে অধিকতর মানবীয় রূপ দেওয়ার মানসে। এ সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল: "বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক মানুষের আকাশচুম্বী সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে; কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ফলে নতুন যে জীবন-ধারার সূচনা ঘটেছে কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ করে কিভাবে তার একটি দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেটার অনুসন্ধান করতে হবে।" উচ্চতর কারিগরি কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের বৃটিশ সিদ্ধান্তের পিছনে হয়ত বা আরও কোনো কারণ ছিল, কিন্তু জ্যাসপার যে উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তন কামনা করেছিলেন এর ফলে তা অনেকাংশে সাধিত হয়েছে। স্বভাবতই, রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন কোনো শিল্প-সংস্থার কাছ থেকে এরূপ পরিবর্তন আশা করা যায় না। এমনকি সেটা জ্ঞানশিল্প হলেও সম্ভব নয়।

স্বশাসনের বুনিয়াদ

রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন শিল্পসংস্থা, এমনকি জ্ঞানশিল্প সংস্থাও, সহজে স্বশাসনের দাবীকে সমর্থন জানাতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি জাতীয় সংস্কৃতির বাহক হতে হয় অথবা একে যদি জাতীয় শক্তি

ও সমৃদ্ধি অর্জনের কাজে নিয়োজিত করা হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণশীল ব্যাখ্যা এবং শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার কথিত ব্যবস্থা অনুমোদন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। যে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য সরকারী দফতর থেকে অর্থ গ্রহণ করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই ওই উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে হবে। যে বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে উঠেছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় ওই ধরনের সরকারী মঞ্জুরী গ্রহণ করতে পারে না। জ্ঞানানুসন্ধান এবং শিক্ষাপ্রদানের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করে—অর্থের বিনিময়ে এমন কোনো প্রস্তাব এই বিশ্ববিদ্যালয় মেনে নিতে পারে না।

এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়কে তার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুসংখ্যক বৃহৎ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় তিন ধরনের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন কার্যসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে: বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, শিশুপালন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা। এগুলির মধ্যে শেষোক্তটিই কেবল শিক্ষায়তনিক স্বাধীনতার বুনিয়াদ হতে পারে। কিন্তু এই শেষোক্তটিকেই যদি আবার পূর্ব-নির্ধারিত কোনো ফললাভের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে আর তর্ক করার কিছুই থাকে না।

ক্লার্ক কের বিদ্রূপ করে বলেছেন: "কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই বড়টা হতে পারে তার চেয়ে বেশী উচ্চাশা পোষণ করে না…উদ্দেশ্যটাকে যতটা সম্ভব ঘোলাটে করে তোলা হয় যাতে অস্বস্তিকর এবং টলটলায়মান ভারসাম্যটা কোনোমতে বজায় থাকে।" কিন্তু এর ফলে ঝুঁকির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় তার কারণ, যারা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যোগ দেয় এবং সমর্থন করে তারা কোনো একদিন বিশ্ববিদ্যালয়টি কি কাজে নিয়োজিত রয়েছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। প্রশ্নের উত্তরটা যদি তাদের বোধগম্য না হয় তাহলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে তুচ্ছ জ্ঞানে বর্জন করতে পারে।

ছাত্রবর্গ

১৯৬০-এর দশকে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছাত্রদের মধ্যে অস্থির-চিত্ততার প্রকাশ ঘটে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের অভিযোগগুলি ক্লার্ক কের কথিত ঘোলাটে পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা জানতে পারেনি কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কি করা উচিত অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ই বা কি, এমন প্রশ্নও তাদের মনে জেগেছে।

অধিকাংশ ছাত্রের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষালাভের ফলে' ভালো চাকুরী এবং উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা অর্জন সম্ভব। কিন্তু যে বস্তুটি সকলেই পাবে বলে আশা করা হয় সেটি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কিভাবে সহায়ক হতে পারে? তাছাড়া, তারা হয়ত চাকুরী পাবে না, কিংবা পেলেও, সেটা হয়ত তাদের মনোমত হবে না। তারা দেখেছে অধ্যাপকেরা সারা দুনিয়া পরিভ্রমণ করে বেড়ান আর তাদেরকে শিক্ষা দেন সহকারীরা। তারা লক্ষ্য করেছে তাদেরকে ক্রমিক সংখ্যাভুক্ত করা হয় এবং কম্প্যুটারের সাহায্যে তাদের মান নির্ণয় করা হয়। লক্ষ্যহীন, বিশৃঙ্খল বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে আরও লক্ষ্যহীন এবং বিশৃঙ্খল করে তোলে।

প্রাচীন আদর্শভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই অভিযোগগুলি থেকে কার্যতঃ না হলেও তত্ত্বগতভাবে মুক্ত ছিল। ওই নীতি অনুসারে গবেষণা এবং শিক্ষা প্রদান একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। তখন ছাত্রদেরকে মানসিক অধ্যাবসায়মূলক কাজে অধস্তন সহকারী হিসাবে বিবেচনা করা হত। ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে বুদ্ধিচর্চা করার সুযোগ পেলে অথবা তার উপযুক্ত হলে এবং অধ্যাপকেরা তাদেরকে সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করলে এই আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল। শিক্ষা প্রদান এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার যে সমস্যা আধুনিক কালের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে জর্জরিত করছে বর্তমানের এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে তার সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্যাগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ হবে

যাবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কাজ করতে ইচ্ছুক শুধু তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন যে এই ভাবে সীমায়িত করা যাবে না তা বুঝে ওঠা মুস্কিল। উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই অংশ গ্রহণের অধিকার আছে। কেননা, প্রত্যেকেরই তার চিত্তকে মুক্ত করার অধিকার আছে। কিন্তু সকলেই তো আর মানসচর্চামূলক জীবন-যাপন করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি শুধু মানসচর্চামূলক জীবন যাপনে অভিলাষী অধ্যাপক এবং ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বনাম প্রশিক্ষণ স্কুল এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

যাদেরকে ভর্তি করা হয় নি তাদের কি হবে? কল্পিত ধারণা অনুসারে ওদের উদারনৈতিক শিক্ষার্জনের এবং মানুষের মত জীবন যাপনের কথা ছিল। ওরা যদি কোনো ধরনের কারিগর হতে চাইত, অথবা ওরা যদি ব্যবসা করতে চাইত কিংবা কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে চাইত তাহলে এই সব কার্য শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত যে কোনো স্কুলে ওরা যোগ দিয়ে জীবন যাপনের উপযোগী ওই সকল যাবতীয় বৃত্তির একটি শিক্ষা করতে পারত। কিন্তু, ওদের উদ্দেশ্য যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থেকে আলাদা সেইহেতু ওদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য বলে গণ্য করা যাবে না এবং এর পরিচালনায় ওদের কোনো বক্তব্যও থাকবে না। কোনো বুদ্ধিজীবী সমাজ বুদ্ধি চর্চায় নিয়োজিত নয় এমন কোনো ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

জ্ঞানশিল্পের সঙ্গে যুক্ত যে সব বিজ্ঞানী শুধু তথ্য সংকলনে অথবা সরকারী বিভাগের হয়ে ফলিত বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন অথবা শিল্পসংস্থার চাহিদা মিটাতে ব্যস্ত রয়েছেন তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপবর্তী কোনো প্রতিষ্ঠানে জায়গা করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করা যেতে পারে না। সরকার বা শিল্পসংস্থাসমূহকে তাদের প্রয়োজনানুগ গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে না দেওয়ার পিছনে কোনো

যুক্তি থাকতে পারে না। যে সব অনুসন্ধানী তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁদেরকে নিবৃত্ত করারও কোনো কারণ নেই। বিশেষজ্ঞদের নিজেদের খেয়াল খুশীমত একাকী কোনো গবেষণা করতে না দেওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে অবশ্য। এই কারণগুলির একটি হচ্ছে, এর ফলে তাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে যায়। কিন্তু এদেরকে যদি এদের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় তাহলে তারা এই প্রতিষ্ঠানকে বিশৃঙ্খল করে তুলতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় যদি বুদ্ধিজীবীদের একটি সম্প্রদায়ে পর্যবসিত হতে পারে তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে।

ইংলণ্ডের প্রবণতাসমূহ

১৯৬০-এর দশকে ইংলণ্ডে যে সংগ্রাম চলেছে তার ফলাফল হবে শিক্ষাপ্রদ। ইংলণ্ডে সরকার একটি 'যুগ্ম' অথবা 'দ্বিপাক্ষিক' উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোরিল বিধানের প্রণেতাদের মনে যে শ্রেণীবিভাগের চিন্তাটি বাসা বেঁধেছিল এই পরিকল্পনাবিদদের পরিকল্পনাতে তারই ছায়াপাত ঘটেছে যেন। নাইজিরিয়াতে এই শ্রেণীবিভাগটি সম্প্রতি কার্যকরী করা হয়েছে। বৃটেনের এই পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বশাসিত ব্যবস্থায় রাখারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উচ্চতর কারিগরি কলেজগুলি অবশ্য এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেরই অংশ বলে পরিগণিত। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি থাকবে 'পাবলিক সেক্টর'। এই 'পাবলিক সেক্টর' নামে কথিত প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চপর্যায়ে বৃত্তিমূলক, পেশাদার এবং শিল্পনির্ভর শিক্ষা প্রদান করবে। অ্যানথনি ক্রসল্যাণ্ড শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে ১৯৬৫ সালে মন্তব্য প্রসংগে বলেন: "আমরা বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী হবো না কেন?" এই প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী

শিক্ষা দেওয়া হবে এবং স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রথম শ্রেণীর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। ক্রসল্যাণ্ড এই সেক্টরকে "সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীন সামাজিক প্রয়োজন বিধানে নিয়োজিত" প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেন।

'পাবলিক সেক্টরের' এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো ডিগ্রী প্রদান করবে না। এই প্রতিষ্ঠান তাদের প্রার্থীদেরকে 'কাউন্সিল ফর ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমিক এ্যাওয়ার্ডস' নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট সুপারিশ করে পাঠাবে। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটিই মান নিরূপণ করবে। পাবলিক সেক্টরের এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণাকার্য চালান হবে বলে আশা করা যায় না। তাদের তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না অবশ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ হবে কারিগর উৎপাদন করা।

রাষ্ট্রের উপর আর্থিক সাহায্যের জন্য নির্ভরশীল হলেও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত হওয়ার মর্যাদা থেকে কখনই বঞ্চিত হয়নি। 'পাবলিক সেক্টর'গুলি সরাসরি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা ন্যূনপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপের অধীন হয়ে থাকে। দ্বিপক্ষীয় পরিকল্পনার তত্ত্বগত দিকটি খুবই স্পষ্ট : বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীন চিন্তা এবং সমালোচনার কেন্দ্র হবে, আর পাবলিক সেক্টরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি চলতি সময়ের প্রয়োজন মেটাবে। এই তত্ত্ব যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চলতি সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে চাপ দেওয়া হয় তার নিষ্কৃতি ঘটবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই তত্ত্ব কি কার্যকরী করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট' কলেজসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। এখন সবগুলোই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি যা কিছু দাবী করেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি তার সবই পেয়েছে। অন্যপক্ষে, 'ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট' কলেজগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চলতি সময়ের চাহিদা মেটানো থেকে অব্যাহতি দেওয়া

হয়নি। ইয়েল, হারভার্ড এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু 'ল্যাণ্ড-গ্রাণ্ট' কলেজগুলির সঙ্গে এই একটি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে এদের অমিল নেই। ওই 'ল্যাণ্ড-গ্রাণ্ট' কলেজ-গুলিকে অবশ্য অধুনা বিশ্ববিদ্যালয় বলেই অভিহিত করা হয়। ইউনি-ভার্সিটি অব সিলিগান যা করছে এবং 'ল্যাণ্ড গ্রাণ্ট' কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত 'সিলিগান ষ্টেট ইউনিভারসিটি' যা করার বাসনা রাখে তার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

ইংলণ্ডের 'পাবলিক সেক্টরের' প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে স্নাতক উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা খুব বেশীদিন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' ডিগ্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানরত অধ্যাপকেরাও খুব বেশীদিন গবেষণা করা থেকে বঞ্চিত থাকতে চাইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে নিম্নমান নিয়ে তাঁরা বা তাঁদের নির্বাচক মণ্ডলীরাও সন্তুষ্ট থাকবেন বলে মনে হয় না। অন্যপক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর চলতি সময়ের চাহিদা মিটাবার জন্য চাপ দান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমিত হয়। কেননা, অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনও এই মতে আস্থাবান যে জ্ঞানই শক্তি।

যদি এতসব বিঘ্ন সত্ত্বেও দ্বিপক্ষীয় শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয় তাহলে তার জন্য ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঐতিহ্যকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। আর জনগণকেও ধন্যবাদ জানাতে হবে তাদের বোধ-গম্যতার জন্য। এটা একপক্ষে, বিশ্ববাসীর জন্য একটি উদাহরণও হয়ে উঠতে পারে।[৪]

মুক্ত এবং দায়িত্বসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

স্বশাসিত একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে কিভাবে এর দায়িত্ব সম্পর্কে দায়ী করা যায়? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ক্রমশঃ অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়। এডওয়ার্ড গীবন এবং অ্যাডাম স্মিথের আমলের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যে এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত ছিল তা বলা যায় না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের

মধ্যে পুনরুজ্জীবনের রসদ খুঁজে পায় না। আধুনিক বিশ্ববিত্তালয়-গুলির বিপদ আরও বেশী। কারণ, বিশেষত্ব অর্জনের দরুন অধ্যাপকের পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং এর ফলে তিনি তার বিষয়কে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলেন। জ্যাম্পার প্রসঙ্গত বলেছেন: "অধ্যাপকমণ্ডলীর সদস্যদের আচরণের সঙ্গে বেনা-রসের পবিত্র অঙ্গনে তালগাছের উপর আসীন বানরকুলের আচরণের তুলনা করা যেতে পারে: প্রতিটি তালগাছে একটি করে বানর বসে থাকে। দেখে মনে হয় তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে অত্যন্ত মনোযোগী রয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে একটি বানর অপর একটি বানরের তালগাছে উঠতে এগোয় তখনই তাকে বেশ কতকগুলি নারিকেলের আঘাত সহ্য করতে হয়।" অধ্যাপকদের অধ্যাপকেরাই নির্বাচন করবেন; কিন্তু বিভাগীয় কর্তা এবং সিলেকশন কমিটি ও অধ্যাপকবিশেষ অনেক সময় একদিকে প্রতিযোগিতার ভয় অন্যদিকে ছাত্রদের প্রতি সুবিচারের দ্বন্দ্বে পীড়িত হতে দেখা যায়। বিশ্ববিত্তালয়ের আবহাওয়া, উপরন্তু কোনো প্রতিভাবানের উপযোগী নয়। শিক্ষায়তনিক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্বনির্ধারিত মতবাদের প্রতি বেশী অনুকূল হয়ে থাকে। প্রতিভার স্ফুরণ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না।

অ্যাডাম স্মিথ শিক্ষায়তনিক জড়তা ও নিশ্চেষ্টতা দূরীকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের বরাদ্দ অর্থ থেকে বঞ্চিত এবং অধ্যাপকদের বেতন ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়কৃত মাহিনা থেকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। জার্মানীতে এককালে এই নিয়মই চলিত ছিল। এর ফলে অনাবশ্যক ব্যাপারে অর্থব্যয় নিবারিত হয়। তবে, এর ফলে প্রতিভা-বানদের চেয়ে টেলিভিশন-শিল্পী ও সস্তা নাটকের শিল্পীরাই বেশী লাভবান হয়ে ছিল। ইংলণ্ডের যে ব্যবস্থাটি কার্যকরী হয়েছিল সেটি হচ্ছে রাজাজ্ঞার মাধ্যমে সরকারী হস্তক্ষেপজনিত। যেহেতু রাজনীতি একটি স্থপতিবিদ্যাসুলভ (architectonic) বিজ্ঞান, সেইহেতু প্রতিটি রাষ্ট্রেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কখন এবং কিভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।

রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে সেটাই অতঃপর প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সম্মান অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করে এবং ওই রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার করে নেওয়া হয়—তাহলে ওই রাষ্ট্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ব্যবহার করবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। যে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে বিবেচনা করে সে রাষ্ট্র যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধ কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় দেবে না সে তো জানা কথাই। যে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সত্যানুসন্ধানী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করে সে রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব জাহির করার প্রয়াস পাবে না। জার্মানীতে হিটলারের শাসনামলের সময়টুকু ছাড়া সমগ্র ইউরোপে এই ধারাই অব্যাহত ছিল। ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যাপক হারে সরকারী সাহায্য পেলেও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত গঠিত বিশেষ কমিটির হিসাব-পরীক্ষার আওতায় রাখা হয়নি। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিকর্তব্য স্থির করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন, ইংলণ্ডে সরকারের মধ্যেও তার প্রবণতা একাধিকবার লক্ষ্য করা গেছে।

যে সব দেশে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতামুক্ত আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ও ব্যবসায়িক দিকটি পরিচালনা করে সেসব দেশে ওই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যধারার উপর কতটা বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে সেটা ওই দেশের ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করেছে। যে সব সাধারণ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের দ্বারা চালিত হয় ইংলণ্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নামে মাত্র পরিচালিত হয় তারা কোনো অধ্যাপককে নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধিতা অথবা কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যমান নির্ধারণ করার কথা ভাবতেই পারেন না। এরা শুধু ব্যবসায়িক দিকটি সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত বোর্ডসমূহ ওই ধরনের সংযমের

পরিচয় দিতে পারেননি। এর কারণ ওই দেশে উচ্চশিক্ষা ঐতিহ্যগত-ভাবে উদ্যোগমূলক বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনপ্রণেতা ও বোর্ডের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে কে কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারবে তা নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত বৃত্তিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বোর্ড অব ট্রাষ্টি, যারা আইনতঃ সম্পত্তির মালিক বলে বিবেচিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাটাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের মত মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা অধ্যাপকবর্গকে বেতনভুক কর্মচারী এবং ছাত্রদেরকে প্রদত্ত মান অনুযায়ী উৎপাদিত উৎপন্ন দ্রব্যবিশেষ বলে বিবেচনা করে। এটা মার্কিন ঐতিহ্যের প্রবণতাকেই প্রকটিত করে। এই ঐতিহ্যের অনুসারীরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দর্পণ হিসাবে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত, আলোঘর হিসাবে নয়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সচল এবং সজীব রাখতে হলে তাকে এই ধরনের চাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কিন্তু এই সজীবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এর সমালোচনারও প্রয়োজনীয়তা আছে। বোর্ড অব ট্রাষ্টি বা অনুরূপ সংস্থা এই সমালোচনার প্রাথমিক উৎস হতে পারে। ব্যবসায়িক কার্যপরিচালনা ছাড়াও এটিই তাদের অন্যতম কর্তব্যকর্ম বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

প্রশাসন ব্যবস্থা

লাল-ফিতা, প্রশাসন যন্ত্র এবং ইত্যাকার যত কিছু আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত আছে তা সব বড় আকারের প্রতিষ্ঠানেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারগুলি এত বেশী গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে যে প্রতিষ্ঠানটি যেন এগুলোর জন্যেই টিকে আছে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। আসলে উল্টোটাই যে সত্য তা যেন মনে হয় না। এই প্রবণতা থেকেই অ-মানবিকীকরণের (dehumanigasion) উৎপত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যধারা একান্তভাবে মাইউটিক (Maeitufic)? প্রাচীন আদর্শের অনুসারী যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষের সঙ্গে

মানুষের যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি শিল্পকারখানার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। আমলাতন্ত্রের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে না পারলেও যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করলেই এটাকে যতভাবে সম্ভব খর্ব করতে পারে। এই উপায়গুলির একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়কে ছোটো ছোটো কলেজে বিভক্ত করে ফেলা। এর ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার চাপ হ্রাস পায় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। অথচ, এর ফলে বৃহদাকার সম্প্রদায়ের সুবিধাগুলিও হারাতে হয় না।

মানসচর্চায় নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে খুব বেশীদিন প্রশাসক হিসাবে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। নেদারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিটি অধ্যাপককে তাঁর জীবনের দুটি বছর উৎসর্গ করতে হয়। একটি বছর অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্পাদক হিসাবে এবং আর একটি বছর 'রেক্টর' হিসাবে। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেক ছোটো ছোটো কলেজ আছে। এ কারণে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমলাতন্ত্রের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি।

যে প্রেসিডেন্ট অথবা 'রেক্টর' বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে আখ্যাত হবেন তাঁকে অবশ্যই ওই সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে তাঁর নামের সঙ্গে যে 'মাহাত্ম্য' জুড়ে থাকে সেটাকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবদান হিসাবেই গণ্য করতে হবে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা হয়ত স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে, এটাই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হিসাবে পেশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যে এটা সাধন করা সম্ভব এই পরিচ্ছেদে তার কোনো প্রমাণাদি পেশ করার উপায় নাই। বরং সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে তা দৃষ্টে মনে হয় স্বশাসিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাবে। স্বাধীন চিন্তা এবং সমালোচনার

কেন্দ্র হিসাবে এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন একটি শিল্পসংস্থায় পর্যবসিত হবে। এই সম্ভাবনাটিকে সত্য করে তোলার জন্য প্রায় প্রত্যেক সরকারই বিপুল অর্থব্যয় ও লোক নিয়োগ করছেন।

এই আশা যদি ফলবতী হয় তাহলে মানবতার পক্ষে তা দারুণ ক্ষতিকর হবে। জ্ঞানের বিনাশ অথবা আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়ার সামিল হবে এটা। একনায়কতাবাদী দেশসমূহ, সরকারী মতাদর্শের প্রচার ও প্রসারই যাঁদের একমাত্র কাম্য তাঁরা হয়তো এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন। গণতান্ত্রিক দেশসমূহ যে এই ফললাভে তত ইচ্ছুক নয় ১৯৬০-এর দশকে তার কিছু কিছু নজির পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এই সময় স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা এবং সমালোচনার কেন্দ্র স্থাপিত হতে লক্ষ্য করা গেছে। এই সমাধানটি মন্দের ভালো; কিন্তু এতে আশ্বস্ত হওয়া যায় না। এই সংস্থাগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য মর্যাদা অর্জন করতে কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

এই প্রবন্ধে একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা হয়ত স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অতীতের অমানবিক এবং মনুষ্যত্ব-বিরোধী শিক্ষাপ্রচার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে এই উক্তি করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন শিল্পসংস্থা হিসাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে তার বিষয়ে কোনো সচেতন সমালোচক এমন উক্তি করবেন না। এটা করা সম্ভব, এর দ্বারা আশানুযায়ী ফললাভও করা যেতে পারে। এই ফলশ্রুতি অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রয়োজনীয় বলেও প্রতিভাত হতে পারে—এমনকি এটা আত্মঘাতীমূলকও হতে পারে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী অনিবারণীয় হয়ে উঠেছে।

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক বাকচাতুরীর খেলা চলেছে। সাম্প্রতিককালের কোনো একজন পণ্ডিতের পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজের 'পরিচর্যা কেন্দ্র' ও আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট সমাজের

তাৎক্ষণিক চাহিদাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একই সময়ে "বিশ্ব-ব্যাপী প্রয়োগ করা যায় এমন নীতিসমূহ অথবা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য এমন বিষয়ে গবেষণায়" নিযুক্ত থাকবে।[৫] কেউ সরাসরি একথা বলতে চান না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ পুরোনো হয়ে গেছে। নাইজিরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার উপর লিখিত একটি গ্রন্থে বুদ্ধিজীবীসুলভ কাজকর্মকে শুদ্ধ বুদ্ধিচর্চার জন্যই নিয়োজিত করা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং এতে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টির প্রয়োজনের কথাও বলা হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় এই একই গ্রন্থে বলা হয় যে, "এগুলি জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনগণ যে রকম ভাবে এগুলিকে কাজে লাগাতে চায় সেভাবেই এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।" এরপর গ্রন্থকার এ কথা বলতে এতটুকুও দ্বিধা করবেন না যে, জনগণ শিল্পক্ষেত্রে উন্নতিসাধন করতে আগ্রহী এবং নাইজিরিয়া-বাসীরাও এটাই চায়। এমনকি শেকস্‌পীয়রের চতুর্দশপদীগুলিকেও "আফ্রিকার বর্তমান জীবন ও সমস্যার আলোকে" শিক্ষা দিতে হবে। কোন শিক্ষককে এর চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আর কখনও হতে হয়েছে কি-না সন্দেহ।[৬]

ক্লার্ককে'র বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন জ্ঞানশিল্প সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এ থেকে মুক্ত করার জন্য অ-স্নাতক ছাত্রদের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতিসাধন, বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একতাসঞ্চার, প্রশাসন ব্যবস্থায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ছাত্রদের জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্যশীল হও-য়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বক্তব্যের উপসংহারে বলেছেন, "বিশ্ব-বিদ্যালয়কে নতুন করে জানতে এর নিজস্ব মস্তিষ্ক এবং শরীর হয়ত আছে কি-না।" রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন একটি কার্যক্ষম শিল্পসংস্থা এই সমস্ত সুবিধাদি কেন প্রদান করবে তার সপক্ষে কোনো কারণ পেশ করা যায় না, কিন্তু কেন করা উচিত নয় তার সপক্ষে বরং অনেক কারণ দেখান যেতে পারে। কের যা চান তা কেবল একটি স্বশাসিত বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়েই পাওয়া সম্ভব। এর ফলে রাষ্ট্রীয় আওতার অধীন শিল্পসংস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার অবলুপ্তি ঘটবে।

এ ব্যাপারে দু'টি উদ্দেশ্য একাধারে সাধন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের কারখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ বজায় রাখা সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যের একমুখীনতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনটাই মৌলিক। উদ্দেশ্য হচ্ছে চাওয়া এবং পাওয়ার মূল সূত্র। এর দ্বারা কি করা হবে না এবং কি করার জন্য অর্থসামগ্রী ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হবে তা নির্ধারিত হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানই বেশীদিন পরস্পরবিরোধী প্রয়োজন মিটাতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মস্তিষ্ক আছে কি-না তার অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ জন্যই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মস্তিষ্কের কাজ হলো যাবতীয় যান্ত্রিক গঠন ও তার কাজকর্মকে অর্থময়, বোধ্য ও একতাবদ্ধ করে তোলা।

৯. বিদ্যার্থী সমাজ

প্রতিটি মহান সভ্যতাই শ্রমকে একটি প্রয়োজনীয় উৎপাত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। শ্রম হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু। যাদেরকে শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় তারা সার্বজনীন জীবনের সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। ডঃ জনসন যেমন বলেছেন: "সমস্ত প্রকার মানসিক উৎকর্ষই অবসরের ফসল। অবসর হচ্ছে একের জন্য অন্যের পরিশ্রমের ফলশ্রুতি।" দ্য তোকে-ভিল-এর মতানুযায়ী, শ্রমের চাহিদাই শিক্ষার্জনের প্রকৃত সীমা নির্ধারণ করে দেয়। তিনি মনে করতেন মানুষকে এ থেকে মুক্তি দেওয়ার কোনো উপায়ই নাই। এ কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কোনো দেশের পক্ষে তার সব নাগরিককে ধনী করে তোলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাদের সকলকে শিক্ষিত করে তোলাও অসম্ভব।

আগেকার দিনে এই প্রস্তাবগুলি সহজ সত্য বলেই বিবেচিত হতো। কিন্তু অধুনা এই বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে। বিংশ শতাব্দী প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের জন্য মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের ভার তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উন্নত দেশে এই পরিস্থিতি এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে মানুষের করার মত কাজ থাকবে কি-না সে প্রশ্নও উচ্চারিত হয়েছে। আদম ও হাওয়া স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে মানুষকে পরিশ্রম করেই জীবনধারণ করতে হয়েছে। এতকালের পুরোনো অভ্যাস থেকে মুক্ত করা হলে মানুষের অবস্থা কি হবে তা নিয়ে অনেকেই রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এ দিকে প্রচুর আলোচনাও হচ্ছে।

এক যুগ আগে আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড় অর্থনীতিবিদ জন-মেন্যার্ড কেইন্‌স, শ্রমহীন পশ্চিমা সমাজের কল্পনা করেছিলেন। আগামী ১০০ বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই সম্ভাবনাকে অত্যন্ত ভীতিজনক বলে বিবেচনা করতেন।

ভীতি কেন?

প্রথম দৃষ্টিতে এই ভীতি অমূলক বলেই মনে হয়। অবসর যদি মানসিক উৎকর্ষের উৎস হয় তাহলে ব্যাপক হারে অবসর উদযাপনের সুযোগ দিলেই অনিবার্যভাবে জ্ঞানের তথা বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাবার কাজই যদি শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রকে সীমায়িত করে দেয় তাহলে ওই প্রয়োজন অপসারিত হলেই সীমাহীন শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে বলে অনুমিত হয়।

কিন্তু পশ্চিমা দেশের মানুষ এবং যে সব দেশ পশ্চিমা আদর্শ গ্রহণ করেছে বা করছে তারা কাজকে এত বেশী ভালোবাসে এবং এই ব্যাপারটি তাদের জীবনের সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে আছে যে, কর্মহীন জীবন তাদের কাছে অচিন্তনীয় বলে মনে হয়। আজকের পৃথিবী দ্য তোকেভিলের দেখা আমেরিকার মত হয়ে উঠছে। দ্য তোকেভিল তার সময়কার আমেরিকায় দেখেছিলেন যাদের জীবনধারণের জন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই তারাও কোনো না কোনোভাবে কাজ করে। যে সমাজ কাজকেই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে বিবেচনা করে সে সমাজে মুখ-রক্ষার খাতিরেও কাজ না করে উপায় থাকে না।

কর্মসহ জীবন থেকে কর্মহীন জীবনে উত্তরণের ফলে যে বিরাট এবং ব্যাপক মানসিক ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হবে লর্ড কিনেস তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে সব দেশ পশ্চিমা ভাবধারা অনুসরণ করে সে সব দেশে বেকাররা সমাজের বোঝা। যখন এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কাজ না করার জন্য তারা দায়ী নয় তখনও বেকার লোকদেরকে সমাজের অন্যান্য লোক অনুকম্পার চোখে দেখে। বেকাররা যে এটা বুঝতে পারে না তা-ও নয়।

লর্ড কিনেস বলেছেন:

এ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রকৃতি আমাদেরকে একান্তভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভব করেছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হয়ে গেলেই মানবজাতি তার ঐতিহ্যসম্মত উপযোগিতা

হারাবে। এতে কি কোনো উপকার সাধিত হবে? কেউ যদি জীবনের সত্যিকার মূল্যমান সম্পর্কে আদৌ সচেতন হয় তাহলে এই সম্ভাবনাটা তার কাছে লাভজনক বলেই প্রতীয়মান হবে। তথাপি, আমি এই ধরনের সম্ভাবনাকে, যাতে মানুষকে তার বহু যুগ যুগ ধরে লালিত অভ্যাস এবং অনুভূতিসমূহকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমি সহজে তা মেনে নিতে পারি না। ব্যাপারটা ভাবতেও আমি ভয় পাই। যাঁরা রুটিরুজির জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেন অবসরটা তাদের কাছে মধুর প্রতিশ্রুতিবহ বিশেষ, যতক্ষণ না তারা এটা পাচ্ছে।··· এর ফলে সৃষ্টির পর থেকে মানুষকে তার সত্যিকার বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। অবসরকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেটাই হবে তার প্রধান চিন্তার বিষয়। তথাপি, আমার মনে হয়, এমন কোনো দেশ বা জনগণ নেই যারা অখণ্ড এবং অঢেল অবসর সম্পর্কে মনে মনে ভীতি পোষণ না করেন। আজকের দুনিয়ার ধনীক শ্রেণীর লোকদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলে এই সম্ভাবনার উদ্বেগজনক দিকটি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারা যায় না।[১]

এতদসংক্রান্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিনেস বলেন, "আমি অতঃপর অদূর ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে তার আশায় পথ চেয়ে আছি।" তিনি আজ বেঁচে থাকলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতেন। তিনি যখন উপরোক্ত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তখনও স্বয়ং-সচল যন্ত্র এবং 'সাইবারনেটিকস'-এর উদ্ভব হয়নি এবং এ সবের ফলে কারিগরি ক্ষেত্রে যে বেকারত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে তারও সূচনা ঘটেনি। কিনেস অবশ্য এই ব্যাধি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বর্তমানকালের লোকেরা এই ব্যাপিটি সম্পর্কে অবহিত নন। কিন্তু আগামী বছরগুলিতে হরহামেশাই তারা এটা শুনতে পাবেন। টেলিভিশন জনগণের নিরাকর্ষণকারী যন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার সময়ে ধনীরা যে ভাবে অবসর সময়কে কাজে লাগাতেন অধুনা সদ্য এই ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরাও

যে সেই ভাবেই অবসরকে কাজে লাগাচ্ছেন তা দেখার সুযোগ তার ঘটেনি।

শিক্ষা "জীবনের সত্যিকার মূল্যবোধ"-এর সঙ্গে জড়িত। শিক্ষা "মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সুহালে জীবন-যাপনে" সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার। সমাজে যে ক্ষেত্রে মনুষ্যশক্তির উদ্বৃত্ত ঘটেছে সে ক্ষেত্রে মনুষ্যশক্তির উৎপাদন শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। অবশ্য যে ধরনের বৃত্তির চাহিদা রয়েছে সে সব বৃত্তিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতেই হবে। পরিবর্তনের দ্রুততার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই ধরনের শিক্ষা শিল্পকারখানায় প্রদানেরই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকাটি উদার নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যাঁরা মানসচর্চা করতে চান অথবা মানসচর্চার ভিত্তি স্থাপন করতে চান এই প্রতিষ্ঠানে তাঁদেরকে প্রবেশের অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্যসমূহ আশ্চর্যজনকভাবে প্রাচীনপন্থী বলে মনে হয়। সারা পৃথিবীতে যখন মনুষ্যশক্তির উদ্বৃত্ত সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে তখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে অধিকতর মনুষ্যশক্তির উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে যখন একটি বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সম্মানের দোহাই দিয়ে মনুষ্যশক্তির বৃদ্ধিসাধন করছে দেখা যায়। সারা পৃথিবীতে যখন জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে তখন এরা এই প্রয়োজন মিটাবার দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে যে সব প্রয়োজন অবলুপ্ত হতে চলেছে সেগুলি মেটাবার কাজে অধিক থেকে অধিকতর শক্তি নিয়োগ করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে কিনেস যে মন্তব্য করেছিলেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, আমরা "দ্রুত পরিবর্তনশীলতা এবং এক অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে আর এক অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করার জটিলতায়" আক্রান্ত হয়েছি। অতীতের প্রভাব আমাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে কি ঘটছে না ঘটছে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করারও সুযোগ পাচ্ছি না।

যে সংস্কৃতি থেকে উপজাত শিক্ষাব্যবস্থা সেই সংস্কৃতির আবহ-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়—এটা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। যদি কর্মই কিলেন্স এর বক্তব্যানুযায়ী, মানবসম্প্রদায়ের 'ঐতিহাসম্মত উদ্দেশ্য' হয় তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যে এই উদ্দেশ্য সাধনেই নিয়োজিত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিতর্কটা অনুষ্ঠিত হতে পারে শুধু শ্রেষ্ঠ কার্যপদ্ধতি নিয়ে। আমরা যদি কর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে বিস্রস্তমনো-চিত্তভাবে এবং সুহালে জীবনযাপনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদেরকে অতি অবশ্যই এই লক্ষ্যকে আমাদের সংস্কৃতিরও অংশভাক করে তুলতে হবে।

শুধু শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারাই এটা সম্পাদন করা সম্ভব নয়

শিক্ষাব্যবস্থা স্বসমাজের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হবে এটাই আশা করা হয়। কিন্তু সমাজ সমর্থন করে না এমন কোনো কাজ বা মতের দ্বারা এই উন্নতিসাধন করতে দেওয়া হবে না। শিক্ষার নিজস্ব একটি গতিনিয়তা আছে একথা স্বীকার করে নিলেও শুধু এর দ্বারাই যে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তেমন আশা করা যায় না। ভলতেয়ার বলেছেন: "শিক্ষার মত মুক্তিদাতা দ্বিতীয় আর একটি নাই। যখন কোনো জাতি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে তখন সেই জাতিকে পৃথিবীর কোনো শক্তিই দাবিয়ে রাখতে পারে না।" এর অন্যার্থ হচ্ছে উদারনৈতিক শিক্ষা মানুষের চিত্তকে মুক্ত করে। কিন্তু রাষ্ট্র এবং যারা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদেরকে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। এরপর সংস্কৃতিতেও এর প্রচলন ঘটাতে হবে: যদি সংস্কৃতি মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে শিক্ষার দ্বারা কোনো ফললাভ হবে না। যে সব দেশে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ চাপ প্রয়োগ করা হয় সে সব দেশে এই জটিলতাটি প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী। বিঘ্ন সৃষ্টি করে অথবা এর তাৎপর্যকে ম্লান প্রতিপন্ন করে সংস্কৃতি শিক্ষাব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানতে পারে।

সংস্কৃতির লক্ষ্যসমূহকে কিভাবে পরিবর্তিত করা যায়? যে সংস্কৃতিতে কাজকেই মানবজীবনের মোক্ষ বলে গণ্য করা হয় আমরা যদি সে সমাজ থেকে বিত্তজনোচিত এবং সুহালে জীবন-যাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি সমাজে স্থান পরিবর্তন করতে চাই তাহলে জীবনের বাস্তব সত্য থেকে আহরিত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই আমাদের এগোতে হবে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনই প্রধান উপায় হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। একমাত্র শিক্ষাই সংস্কৃতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই চাপ অবশ্য চূড়ান্ত না-ও হতে পারে। বর্তমানে যে বাড়াবাড়ি চলেছে নিম্নোক্ত লাইনগুলিতে তার সমর্থন মিলবে: "নাইজিরিয়ার শিক্ষাখাতে অর্থ বিনিয়োগের প্রশ্নটিকে জীবনমরণ সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। কেননা, এই বিনিয়োগ এর উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কেননা, নাইজিরিয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি উন্নতি এবং শক্তি সামর্থ এই বিনিয়োগের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।"[২]

কোন্ কোন্ যোগ্যতার ভিত্তিতে এই বিনিয়োগ করা হবে তা নাইজিরিয়াতে আরও কেমন কি ঘটছে তার উপর নির্ভর করে। জাতীয় নিরাপত্তা যদি জরুরী বলে স্বীকৃত হয় তাহলে শিক্ষার চাইতে সামরিক বাহিনীতে বিনিয়োগ করা অধিক ফলপ্রসূ হবে। যদি অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নতিবিধানই লক্ষ্য হয় তাহলে রাস্তাঘাট এবং উত্তম পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থায় বিনিয়োগ লাভজনক হবে। আর যদি নাইজিরিয়ার 'সমগ্র শক্তি'র উন্নতি সাধন লক্ষ্য হয় এবং এই 'সমগ্র শক্তি'কে যদি সাধারণ বোধবুদ্ধির বিকাশ এবং বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বের অংশ বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রভাবের গুরুত্বও অনুধাবন করতে হবে সেইসঙ্গে।

সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ

অন্যবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাবের তালিকার শীর্ষে রয়েছে গণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবার, প্রতিবেশ, গির্জা এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী

প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট মানুষদের জীবন ও মতাদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বেশ কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক নেতা এবং রাজনৈতিক দলগুলি নাগরিকদের চরিত্র ও চিন্তাধারা গঠনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। আমরা যদি এমন একটি দেশের কল্পনা করি যেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তথাকার মানুষকে বিজ্ঞানোচিত এবং সুহালে জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে দেশে যদি উপরোল্লিখিত সংস্থাগুলি জাতীয় নিরাপত্তা অথবা অর্থনৈতিক ও কারিগরি উন্নতিবিধানে নিয়োজিত থাকে তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা কোনো ফললাভ সম্ভব হবে না। এই শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কৃতির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে এই যে, উপরে যে পরিস্থিতির কথা বলা হলো সেটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কেননা, ওই রকম একটি দেশে ওই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না।

যে দেশ মূলতঃ ক্রেতা এবং উৎপাদক গড়ে তোলার কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকে সে দেশের পক্ষে মনকে মুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। কেননা, উৎপাদন, বিক্রয় এবং মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত করার কাজ একসঙ্গে সম্পাদন করা যায় না। এই ধরনের দেশ নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রেতা এবং উৎপাদক হিসাবে গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করবে। যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনের ভাগ্যে এটাই ঘটেছে। এই ব্যবস্থাটিকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা যেত—কিন্তু বাণিজ্যিক সংস্কৃতিতে এটা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য একটি উদাহারণই যথেষ্ট। এ যেন গুটেনবার্গের মহৎ আবিষ্কারকে শুধু সচিত্র হাস্যরসাত্মক চিত্রকাহিনী ছাপার কাজে ব্যবহার করার সামিল। এই যন্ত্রটি আলোকায়নের কাজে ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল—এটা সম্ভবও ছিল। কিন্তু তা না করে এটিকে প্রধানতঃ সাবান, বিয়ার, জীবানুনাশক ওষুধ এবং সিগারেট বিক্রির কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। দর্শকদের এ সব প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করার জন্য বিজ্ঞাপনের

ফাঁকে ফাঁকে সস্তা প্রমোদ পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকার ব্যবসায় হচ্ছে ব্যবসায়, এতে ক্যালভিন কুলিজের এই প্রস্তাবটিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

আমি আগেও বলেছি, টেলিভিশন এবং এর সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহ যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা দেয় শিক্ষার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। সুতরাং পুনরায় আমাদের সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হচ্ছে: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কি ভাবে ঘটান যায়? যদি শিক্ষাব্যবস্থা এটা না করতে পারে, অথবা যদি শুধু শিক্ষার দ্বারাই এটা সাধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে আর কিভাবে সম্ভব?

কিভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়

আমাদের কালের সবচেয়ে মহত্তম সামাজিক পরিবর্তন অর্থাৎ কৃষ্ণকায়দের মুক্তি কিভাবে সংঘটিত হয়েছে অথবা ঔপনিবেশিকতাবাদ কি ভাবে লোপ পেয়েছে, আমরা যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করি তাহলে এই জন্য শ্বেতাঙ্গদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাহবা দেওয়া যাবে না। আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে এই একই কথা প্রযোজ্য। উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় তা কারণ ও গুলোকে আর আয়ত্তে রাখা সম্ভব ছিল না। মার্কিন দেশে নিগ্রোদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় তার কারণ তাদেরকে আর দমিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অবশ্য এই কথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, এ ব্যাপারে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবক্তা এবং নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অবদানও কম ছিল না। কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সেটি হচ্ছে গত ১০০ বৎসর ধরে ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শিক্ষাব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছে তা থেকে এমন কোনো শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ নেতার আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এই আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে এই বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে যে, মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন জীবনের মূল সত্যগুলি অনুধাবনের

মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, লর্ড কিনেস যে পরিবর্তনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটি ছিল মৌলিক। এটা হচ্ছে মানবজাতির এক উদ্দেশ্য থেকে আর এক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি এখন পর্যন্ত স্বশাসিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আদর্শ বজায় রাখে তাহলে নেতৃত্বও এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্য থেকেই আসবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের মূল সমস্যাগুলির অনুসন্ধান ব্যতীত অন্যবিধ কাজেই বেশী মনোযোগ অর্পণ করেছে।

যে সব ব্যক্তি এবং দল জীবনের মৌল সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং যাঁরা তাদের সহ নাগরিকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে তাঁরা যা দেখেন সেটাই সত্য, তাঁরাই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে লেখক, শিল্পী, পণ্ডিত অথবা নিজস্ব সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম যে-কোনো ব্যক্তিই থাকতে পারেন। এটা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের দ্বারাই সম্ভব অথবা সভ্যতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনায় নিরত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে।

কর্মহীন সমাজের লক্ষ্যসমূহ

ঐতিহ্যসম্মত কর্মোপযোগিতা থেকে পরিবর্তন সম্ভব; এই সম্ভাবনাটি স্বীকার করে নিলে এর ফলে আমাদের যাবতীয় ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে যায়। এর ফলে এই প্রথম প্রত্যেকের মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ ফলবতী হয়ে ওঠে। এর মানে দাঁড়ায় এই যে, সমাজ অতঃপর জীবন-ধারণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে সার্বজনীক কল্যাণের পথ আবিষ্কার ও তাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে, আমরা বিশ্ব-সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যেতে পারব বলে ধরে নিতে পারি। এটা হলে বৃহৎ যুদ্ধের ঝুঁকি এড়ান সম্ভব হবে এবং অনাহার ও যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সম্ভাবনাও লোপ পাবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

তাহলে সমাজ আর কি নিয়ে টিকে থাকবে? নর এবং নারীরা

কিভাবে তাদের সময় অতিবাহিত করবে? শিক্ষা তখন সত্যিই স্বয়ং-নির্ভর হয়ে উঠবে। কিন্তু সত্যিই কি তা হবে?

পশ্চিমী দেশগুলিতে কর্ম-সময়ের হ্রাস ঘটানোর ফলে জনগণের মধ্যে বুদ্ধিচর্চার প্রসার ঘটেছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ১৯৬০-এর দশকে যাঁরা অধিকতর শ্রমমুক্ত সময় উপভোগের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মদ্যপানের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আধুনিক মানুষের লোভী স্বভাবকে প্রকটিত করে তুলেছে। এতে অবশ্য মানুষ শ্রমমুক্ত অবসরকে কেমন ভয়ের চোখে দেখে তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মানুষ যে কোনো মূল্যে এটাকে এড়াতে চায়। অতীতকালে এ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাকেও খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায় না। অতীতের যে সমাজগুলি সমৃদ্ধি ও কর্মহীন অবসর উপভোগের সুযোগ পেয়েছিল সেগুলি কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এদের ধ্বংসের কারণ হিসাবে সমৃদ্ধি ও কর্মহীন অবসরকেই মূলতঃ দায়ী করা হয়েছে। একমাত্র এথেন্সই একটি বিদ্যার্থী সমাজ গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু এর আয়তন ছিল অতি ক্ষুদ্র এবং সম্ভবতঃ এটা ছিল একটা উঁচু ব্যাপার। যাই হোক, এটা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেনি। এথেন্স ভোগ আর বিলাসেই মত্ত ছিল।

পদ্ধতিগত শিক্ষাব্যবস্থায় বয়স্করা যে সহজে সাড়া দিয়েছে তা বলা যায় না। যেখানেই বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেই বুদ্ধির বিকাশ ব্যতীত অন্য একটি উদ্দেশ্য সাধনকেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ডেনমার্কে এই ব্যবস্থা চালু করার পিছনে ১৮৬৪ সালে প্রুশিয়ানরা যে অত্যাচার এবং অবমাননা করেছিল তা থেকে আশাহতি পাওয়া উদ্দেশ্যটাকে প্রকটিত করে তোলা হয়। সুইডেনে মদ্যপান নিরোধ আন্দোলনকে বড় করে দেখান হয়। ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দৃঢ়চিত্ততা থেকে এর উদ্ভব হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা ভাল চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দেয়।

মানুষের প্রকৃতি এমনই যে, সে সারাজীবন শিক্ষার্জন করতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও এর সমর্থন পাওয়া গেছে। মানসিক স্বাস্থ্যের গঠনে শিশু জীবনের প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিলেও বয়স্ক মানুষের যে কোনো সুযোগ-সুবিধাই নাই তা বলা যায় না। আমরা জানি জীবনের যে কোন পর্যায়ে মানবতা-বিরোধী শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। মানুষকে মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে হলে বিদ্যার্জন অব্যাহত রাখতে হবে।

এর স্বপক্ষে অসংখ্য যুক্তি আছে। একটি হলো, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি অভিজ্ঞতা ব্যতীত শিক্ষা করা যায় না। এই বিষয়গুলিতে যে যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার পক্ষে বুঝতে পারাটা তত সহজ হয়ে পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, বহু পুরাতন এই উক্তিটির পশ্চাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক সমর্থনও আছে। পদ্ধতিগত শিক্ষাব্যবস্থার বিলোপসাধনের ব্যাপারটিকে জ্ঞানী হওয়া থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার সামিল বলেই গণ্য করতে হবে।

যতদিন কর্মের সাধনাই ছিল জীবনের লক্ষ্য ততদিন শিক্ষাকে এর প্রস্তুতি হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। এ কারণেই আবার শিক্ষাকে শিশুদের রোগবিশেষ বলেও গণ্য করা হয়েছে। একবার আক্রান্ত হলে এটা আর যেমন আক্রমণ করে না, এই শিক্ষাও তেমনি। শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে গড়ে তোলার ফলে এই মনোভাবটি আরও সবল হয়ে উঠেছে ঃ একটি পর্যায়ে পৌঁছানোর অর্থ পিছনে ফেলে আসা পর্যায়টি 'খতম হয়ে গেছে'। এ কারণেই কোনো শিক্ষাকে যদি প্রয়োজনানুগ বলে বিবেচনা করা হয়—যথা, চাকুরীপ্রাপ্তি, বিবাহ অথবা উপাধিলাভ—তাহলে উদ্দিষ্ট বস্তু লাভের সঙ্গে সঙ্গে এর উপযোগিতাও শেষ হয়ে যায়। কোনো একটি বিশেষ সময়ে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় এমন কোনো বস্তু লাভের জন্য যদি শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয় তাহলে সে শিক্ষার উপযোগিতাও এই বস্তুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাবে।

পরিবর্তনের দ্রুত হার

মার্গারেট মীড ১৯৬০-এর দশকের পরিস্থিতিকে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমরা যে পরিবর্তনের নতুন ধারাকে সনাক্ত করতে অসমর্থ হয়েছি সেটার অজস্র প্রমাণ আছে। কোনো ছাত্র কলেজে প্রবেশের সময় তাকে যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল ছাত্রটি কলেজ থেকে বের হয়ে আসার সময় সেই বিষয়টিতে মৌলিক পরিবর্তনাদি সাধিত হলেও কলেজগুলি ছাত্রদেরকে 'সুশিক্ষা' দিতে সক্ষম বলে দাবী করা হয় এবং তাদেরকে 'শিক্ষা' প্রদানের পর ডিগ্রীও দেওয়া হয় যথারীতি। এই সমস্ত ধ্যান-ধ্যারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমরা আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'শিশুদের' কম অথবা বেশী সময়ের জন্য শিক্ষার্জনের নিমিত্ত রেখে দিই। তারা একবার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলেই আমরা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নিই। আমরা মনে করি তারা আর শিক্ষালাভের উপযোগী নয় অথবা তাদের আর 'শিক্ষার' প্রয়োজন নাই। কেননা, আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে কিংবা অনেকগুলো খণ্ডের সংযোজন করে এটাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে অধীত করার সুযোগ দেওয়া হবে। এইভাবে আমরা নতুন যুগের জাজ্বল্যমান সত্যটিকেই অস্বীকার করি। সেই সত্যটি হচ্ছে ঃ যে যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে আজীবন সেই একই পরিবেশে লালিত হবে না এবং পরিণত বয়সে সে যে পরিবেশে কাজ করেছে সেই একই পরিবেশে মৃত্যু-বরণ করবে না। যাঁরা বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা অথবা চারু ও কারুকলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন আধুনিক জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তাঁরা আরও বেশী অবহিত। কখনও কখনও মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে পুরোণ এবং চিরস্থায়ী বলে গৃহীত ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই বিশ্বে কারও পক্ষেই 'শিক্ষা সমাপন করা সম্ভব নয়'। আমরা চলতে-বলতে লিখতে-

শিখছে এমন ছাত্র চাই না। আমরা 'শিক্ষা পেয়েছে' বা 'শিক্ষা পেতে চলেছে' এমন ছাত্রও চাই না। আমরা যুগের দাবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষালাভ করতে চায় এবং পারে এমন ছাত্র চাই।[৩]

সংক্ষেপে আমরা একটি বিদ্যার্থী সমাজ কামনা করি।

দুটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ্য। এক, কর্মহীন সময়ের তুলনামূলক বৃদ্ধি এবং দুই, পরিবর্তনের দ্রুত হার। এই দ্বিতীয়োক্তটির মোকাবিলা করতে হলে সর্বদা বিদ্যার্জনের প্রয়োজন আছে। প্রথমোক্তটিই এটি সম্ভব করে তুলবে। আরনোল্ড টয়েনবি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে শিক্ষার মূল্যায়ন করে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন:

যে সব মানুষ আগে আর কখনও এই সুবিধাটি ভোগ করেনি কর্মহীন অবসরের সুবিধাটুকুকে তারা অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তথাপি এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আদিম পরিবেশের উর্ধ্বে ক্ষুদ্রসংখ্যক কতকগুলি মানুষ কর্তৃক অবসরকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে লাগানোর ফলেই সভ্যতার ধারার যাবতীয় উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে যে-কোনো শিল্পসংস্থার শ্রমিকের কাছে চাকুরীহীনতা একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। কেননা, এর ফলে রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তার চেয়েও বড় কথা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের সময়কার বেকার শ্রমিক নিজেকে শ্রমিক সমাজে অবাঞ্ছিত বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গ্রীকরা অবসরকে মানুষের যাবতীয় শুভ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতিবহ বলে বিবেচনা করতেন। আজকের দুনিয়ায় স্বয়ংচালিত যন্ত্রের প্রচলনের ফলে শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকেরা আত্মসম্মান বা অর্থকরী দিক দিয়ে কোনো লোকসান না সহ্য করেও অবসরের সুফল ভোগ করতে পারবেন।

এই অশ্রুতপূর্ব অবসর যদি হঠাৎ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে যে তারা আংশিকভাবে এর অসদ্ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুকাল আগে বা পরে হলেও আমরা এই অবসরের খানিকটা অংশ যে বয়স্ক শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করতে

পারব সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। সারাজীবন ধরেই আমরা অনিয়মিত শিক্ষা লাভ করি। আমাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শিক্ষিত করে তোলে। এটা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু গত কয়েক সহস্র বৎসরের দারিদ্র্য প্রপীড়িত সভ্যতায়, এমনকি বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের পক্ষেও, সাবালক বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়নি। এর ফলাফল হয়েছে দুঃখজনক। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে এমন এক বয়সে পাঠ্যপুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছে যখন তার এই পাঠ্যবস্তু থেকে আহরিত জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করার মত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়নি। পরবর্তীকালে সে যখন পাঠ্যপুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তখন আর তার পক্ষে এই ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলে তার জ্ঞানতৃষ্ণা অপূর্ণ রয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ধনীক সমাজে আমরা প্রতিটি বয়স্ক নারী-পুরুষকে তাদের জীবনের যে কোনো পর্যায়ে বয়স্ক-শিক্ষা দিতে পারব। ডেনমার্কে, যেখানে সাফল্যজনকভাবে একটি কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, ইতিমধ্যেই এই নতুন সুযোগ-সুবিধাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। এই দেশটিতে গ্রীকদের অনুসৃত পন্থায় দিনেমার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে (এই স্কুলগুলি শিশুদের জন্য নয়, বয়স্কদের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) বয়স্কদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। দিনেমার কৃষকেরা এই সমস্ত স্কুলে ছ'মাস বা এক বৎসরকাল শিক্ষালাভের জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থসঞ্চয় করে থাকেন। সব কৃষকই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সময় এমন একটি বিষয় বেছে নেন যা তার সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে, অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তার বিষয় নির্বাচন করেন না। 'শান্তির জন্য পরমাণুর' যুগে শিক্ষাব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করবে দিনেমারদের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারি। স্বয়ংচালিত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত যন্ত্রশক্তি যে অবসর জোগাবে তা এই উদ্দেশ্যেই কার্যকরী করা হবে।[৪]

যখন কোনো একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে (এককালে প্রতিটি জাতিই যা করবে) এবং যখন কোনো জাতি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে তখন সেই জাতি উপলব্ধি করে যে, পরিবর্তনের দ্রুত হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার জন্য অবসর সময়কে সার্বক্ষণিক শিক্ষার্জনের কাজে লাগাতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এখন কি সেই জাতি দিনেমারদের অনুসরণে "প্রতিটি নারী-পুরুষকে বয়স্ক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আংশিক সময় বয়স্ক শিক্ষা দেবে?" শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলির কার্যকলাপ থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। এই শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক লোক অধিক থেকে অধিকতর সময় বয়স্ক শিক্ষাসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। তারা এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে এক বৎসরকাল পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে।

বেশ কতকগুলি দেশে এই ধরনের বেশীর ভাগ কাজে যথাযথ মনোযোগ অথবা গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। এই দেশগুলিতে অবসর সময়কে আমোদপ্রমোদ অথবা অন্যবিধ ব্যসনে ব্যবহার করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু ডেনমার্কের গৃহীত ব্যবস্থা থেকে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই সুবিধাকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির এবং রাষ্ট্রেরও, অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজে লাগান হয়েছে। টোয়েনবি এই জাতীয় ঘটনাকে অবসর সময়ের সাময়িক অযৌক্তিক ব্যবহার বলে নির্দেশ করেছেন। তার এই মূল্যায়ন নির্ভুল। আমোদ-প্রমোদ এবং আরাম-আয়েশ যে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ থেকে অব্যাহতি লাভের পর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হলেও কোনো যুক্তিবাদী প্রাণীর এটাই অবসর যাপনের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে না। যে বৃত্তির জন্য ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে শিক্ষা সমাপনান্তে সে যদি সেই বৃত্তিতে নিযুক্তি লাভ করতে না পারে তাহলে তার কাছে ওই শিক্ষার কোনো আকর্ষণ থাকবে না।

সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, টোয়েনবির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠবে। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম সচিব ডব্লিউ উইলার্ড উইজ

সরকারীভাবে বয়স্ক শ্রমিকদের জন্য 'প্রতি সাত বৎসর অন্তর' এক বছর ছুটির পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় কয়েকজন শিল্পপতিরও সমর্থন ছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে শ্রমিকেরা বেশ কিছুসময় কারখানার কাজ থেকে অব্যাহতি পাবেন এবং ওই সময়টুকু শিক্ষার্জনের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এরই ফলস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের তালিকা পুস্তকের সাতষট্টি পাতা জুড়ে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যার্থী সমাজ

এরচেয়ে আরও এগিয়ে যাওয়া এবং বিদ্যার্থী সমাজের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা কি সম্ভব? এই রকম একটি সমাজে আংশিক সময় বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা ছাড়াও মূল্যবোধ পরিবর্তনের উপযোগী আবহ বর্তমান থাকবে। এই মূল্যবোধের পরিবর্তন এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে মনুষ্যত্ব অর্জনই এর শিক্ষার মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন এই লক্ষ্য অর্জনেই নিয়োজিত হয়। এথেন্সবাসীরা এই কাজটিই করেছিলেন। এথেন্সবাসীরা শুধু নাগরিকদের আংশিক সময় বয়স্ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই করেন নি, তাঁরা প্রতিটি নাগরিকের পূর্ণ মানবিক গুণ বিকাশের উপযোগী ব্যবস্থার পত্তনও করেছিলেন। আমাদের মান এবং শিক্ষা অনুযায়ী আমরা এথেন্সবাসীদেরকে অশিক্ষিত বলে বিবেচনা করে থাকি। তার কারণ, সুসংবদ্ধ এবং খরচবহুল শিক্ষাব্যবস্থা এবং উৎপাদন সংস্থার বিষয় তাঁরা অবহিত ছিলেন না। তাঁদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু এঁরাই ছিলেন মানবজাতির শিক্ষক। এথেন্সে শিক্ষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না। নির্দিষ্ট জায়গায় জীবনের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা ধরে এর চর্চা করা হতো না। এটাই ছিল সমাজের প্রধান লক্ষ্য। শহরই মানুষকে শিক্ষা দিত। এথেন্সবাসীরা তাদের সংস্কৃতি থেকেই শিক্ষার্জন করত।

এটা সম্ভব হয়েছিল দাসপ্রথা প্রচলিত থাকার ফলে। এথেন্সবাসীরা অবসর উপভোগ করত। আমাদের 'স্কুল' শব্দটি গ্রীকদের 'অবসর' শব্দ থেকেই এসেছে। এথেন্সবাসীরা কর্মমুক্ত সময়কে অবসরে রূপান্তরিত করতে জানত। তারা এই অবসর সময়কে জ্ঞানচর্চা এবং সমাজকে শাসন করার প্রণালী শেখার কাজে নিয়োজিত করেছিল। দাসপ্রথার প্রচলন থাকায় তারা প্রচুর কর্মহীন অবসর পেত। এই অবসর সময়ে ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের মাধ্যমে এথেন্সবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও মানসচর্চা অব্যাহত রাখত। এগুলি ছিল তার মানসচর্চায় সহায়ক। এইভাবে কর্মমুক্ত সময়কে তারা অবসরে রূপান্তরিত করত।

এথেন্সের গুটিকয় ভাগ্যবান নাগরিকদের জন্য দাসপ্রথা যে উপকার সাধিত করেছিল আধুনিক মানুষের জন্য যন্ত্র সেই কাজ করতে সক্ষম। এর ফলে বিদ্যার্থী সমাজ তথা স্যার জুলিয়ান হ্যাক্সলী কথিত পূর্ণাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। অবশেষে মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ একটি বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে।

মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন

শিক্ষা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠবে কি-না সেটা মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। কারিগরি বিদ্যা এই সুযোগটাই শুধু দিতে পারে। মূল্যবোধের রূপান্তরে শিক্ষার একটি ভূমিকা রয়েছে। যে সমাজে সকলেই উদারনৈতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্জন করছে এবং ওই প্রতিষ্ঠানসমূহে বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত রয়েছে এবং যে সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে সে সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এ ধরনের সমাজে পূর্বেই মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে যায়; তা না হলে শিক্ষা সম্পর্কে এই ধারণা সে সমাজে গৃহীত হতে পারে না।

মানুষ নিজেই নিজেকে তৈরী করে। সে তার পরিবেশকে গড়ে তোলে। প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাও তারই কাজ—এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। আবার পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানই মানুষকে গড়ে তোলে। মানুষের সৃষ্ট বেশীর ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতি মূল্যবোধকে জিইয়ে রাখার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। জীবনের মূল সত্যগুলি অনুধাবনের ফলে মানুষ এই মূল্যবোধগুলির পুনর্বিবেচনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে এইদিকে পরিচালিত করতে পারে। জীবনের মূল সত্যগুলি অনুধাবনকে এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। নতুন যে মূল্যবোধগুলি বর্তমানে অর্জন করা সম্ভব এবং এ ব্যাপারে যে সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলিরও অনুসন্ধান আবশ্যক। এই বোধকে জাগ্রত করাই ছিল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

মানব জীবনের মূল বিষয়গুলির স্বীকারোক্তিই ঐ সমস্ত মূল্যবোধকে পুনর্মূল্যায়ন এবং শিক্ষাকে নতুন পথে পরিচালিত করতে শক্তি যোগাবে। নতুন মূল্যবোধসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং শিক্ষার সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা এই সকল মূল্যবোধ অর্জনে সহায়ক হতে পারে। প্রথম পদক্ষেপ হইল জীবনের মূল বিষয়গুলির উপর সাধারণ জ্ঞান। এই ধারণার উপর সামান্যতম আলোকপাত করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।